একটি
THE BUSINESS STANDARD
প্রকাশনা

২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ | সংখ্যা ১৬১
SATURDAY 14 DECEMBER, 2024

ক্যাম্পেন গেরিলারা।

ক্র্যাক প্লাটুন

গেরিলা দলের প্রতি মানুষের ভালোবাসার এক নাম

হাবিবুল আলমের সাক্ষাৎকার

সৈয়দ মূসা রেজা

ক্র্যাক প্লাটুন পাকিস্তানি বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করেছে। অন্যদিকে রেডিও বাংলাদেশ ঢাকা থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ঘোষণা দেওয়ার যে নকশা ইন্ডিয়ান আর্মি করেছিল, তা-ও করেছে বানচাল!

১৯৭১। ১৪ আগস্ট। পাকিস্তান দিবস। এদিন ঢাকায় সবাই চমকে উঠল বাংলাদেশের পতাকা, সবুজ পটভূমিতে লাল বৃত্ত এবং তার মাঝে আঁকা রয়েছে বাংলাদেশের মানচিত্র, নিয়ে গ্যাসবেলুন উড়ছে ঢাকার আকাশে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা। কঠোর নিরাপত্তার চাদরে মোড়া নগরীতে এমনটি কেউই আশা করেনি। সেদিন সকাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে কাটাতে হয়েছে অন্য ধরনের ব্যস্ততায়। লক্ষ্যভেদী গুলি করে আকাশে ভেসে ওঠা বেলুনকে ফুটো করার গুরুদায়িত্ব।

এদিকে বাংলাদেশের অসম সাহসী গেরিলারা তখন পুরো মাত্রায় তৎপর ঢাকায়। এর আগে দুঃসাহসী কয়েকটা অভিযানও চালিয়েছে তারা। পিলে চমকে দিয়েছে আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজির নেতৃত্বাধীন সেনাদলকে। সেসব অভিযানের সাথে তুলনা করলে পতাকা ভেসে ওঠায় কোনো রক্তপাতের ঘটনা বা ভয়াবহ বিস্ফোরণ বা ঘটেনি। কিন্তু এ ঘটনায় ঢাকায় মোতায়েন পাকিস্তানি বাহিনীর সেনাসদস্যদের আসলে বার্তা দেওয়ার চেষ্টা যে তোমরা আমাদের নজরদারিতে আছ। চাইলেই করতে পারি হামলা।

তবে চমকে দেওয়ার মতো গেরিলা তৎপরতার শুরু আরও আগে। আর এ তৎপরতার মূলে ছিল একটি বাহিনি। মানুষের মুখে মুখে ঢাকায় তৎপর এ বাহিনীর কথা তত দিনে ছড়িয়ে পড়েছে, নাম হয়ে গেছে ক্র্যাক প্লাটুন। বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক, শাহাদত চৌধুরী (পরবর্তী সময়ে বিচিত্রার সম্পাদক), রুমিসহ আরও অনেকেই ছিলেন এ বাহিনীতে।

ঢাকায় প্রথম বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো যে অপারেশন চালানো হয়, তার নেতৃত্বে ছিলেন হাবিবুল আলাম। মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা আরও অনেকের মতো তাকেও লড়াইয়ে নামতে উদ্বুদ্ধ করেছে। টিবিএসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, অভিযান শেষে ত্রিপুরার ঘাঁটিতে ফিরে যাওয়ার পর ক্যাপ্টেন হায়দার বলেছিলেন, দিস বয়েজ আর রিয়েলি ক্র্যাক। তবে প্রথমেই তাদের পরানো হয়নি ক্র্যাক প্লাটুন নামের মুকুট। অক্টোবর নভেম্বরের দিকে তারা এ নামে পরিচিত হয়ে উঠতে থাকে মানুষের কাছে। মানুষ ভালোবেসেই এ নাম দেয় তাদের গেরিলা দলকে। কিন্তু আনুষ্ঠানিক কোনো দলিলপত্রে এ নামটি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

প্রচ্ছদ: মাহতাব রশীদ

সাপ্তাহিক ইজেল, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড-এর একটি প্রকাশনা, ৪/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা ১০০০। বিজ্ঞাপন: ০১৭১১৫৪৭০৫০ tbs.features@gmail.com tbsnews.net

মুক্তিযুদ্ধে নিজ অভিজ্ঞতা নিয়ে বাংলা এবং ইংরেজিতে তার লেখা ‘ব্রেভ অব হার্ট’ বইয়ের কথা উঠলে তিনি জানান, বইটি লিখতে ছয় বছর লেগেছে। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৬ সালে। বই লেখার সময় পুরোনো কথা স্মরণে আসায় কখনো কখনো কেঁদেছেন, তারপর ধাতস্থ হয়ে আবার লিখতে বসেছেন। সাধারণত দিনের কাজকর্ম সেরে রাত ১১টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত লিখতেন। বই প্রকাশিত হয়েছে মিজানুর রহমান শেলীর জোরাজুরিতে। বই প্রকাশিত হওয়ার পর পাকিস্তান, ভারতসহ নানা দূতাবাসকে দিয়েছেন। পাকিস্তান ও ভারত বাদে আর সব দূতাবাস সৌজন্য জবাব দিয়েছে। বই প্রকাশের পর হাবিবুল আলমের জন্য ভারতের ভিসা পাওয়া বেশ কঠিন হয়ে গিয়েছিল। সরাসরি কারণ না বললেও বইটিই যে তার কারণ, বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

হাবিবুল আলমের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়া, সীমান্ত অতিক্রমের যাত্রা, প্রশিক্ষণ, ফিরে আসার গল্প:

এপ্রিল মাসের একদিন ফজরের নামাজের আগেই বিছানা ছাড়ল আলম। আগেই শলাপরামর্শ করা ছিল আরও চার সাথির সাথে। স্বাধীনতার লড়াইয়ে যোগ দিতে যাবে তারা। সেদিন বিছানায় কোলবালিশকে এমনভাবে পেতে রাখে যেন বাড়ির লোকেরা দেখলে মনে করবে চার বোনের একমাত্র ভাই আলম ঘুমাচ্ছে বেঘোরে। আসলে আলম তখন চুপিসারে বিড়াল-পায়ে দিলু রোডের ঘর ছেড়েছে। পিআইয়ের একটি ব্যাগে সামান্য কিছু জামাকাপড়ই তার সম্বল। ঘর ছাড়ার আগে একটা চিরকুটে লিখে রেখে যান যাত্রার উদ্দেশ্য।

ঢাকা থেকে অতিযাত্রীবোঝাই বাস তাদের বাহন হয়। নিজেদের মধ্যে পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক যাত্রাপথে কোনো আলাপ-সালাপ করেনি এই পাঁচ তরুণ। পাঁচজনই বাসের ছাদে গাদাগাদি হয়ে বসেছিল। ইলিয়টগঞ্জের কাছে গিয়ে ঝোড়ো বাতাস ও বৃষ্টিতে ভেজে। চান্দিনার পরের স্টেশন নিমসরে নেমে যায়। সেখান থেকে শ্যামপুর বাজার পর্যন্ত হেঁটে পাড়ি দেয়। ডানে ময়নামতি সেনানিবাস এবং কুমিল্লা শহর রেখে দুই রিকশা নিয়ে পূর্ব দিকে এগোতে থাকে। রেললাইন পার হয়ে এবারে তাদের পথ চলতে হয় হেঁটে। কুমিল্লার কাছাকাছি সীমান্ত দিয়ে ঢোকে ভারতে। মতিনগরের গ্রাম্য বাজারে ক্ষুধার্ত পাঁচজন হাতে তৈরি রুটি, মিষ্টি এবং ডিম দিতে বলে।

খাওয়ার সময় সেখানে উইলি জিপ নিয়ে সামরিক পোশাক পরা এক তরুণ হাজির হন। খাওয়ার জন্যেই ওই দোকানে ঢোকে সে-ও। সামরিক পোশাকে কোনো পদবির পরিচয় নেই। কোমরে ঝুলছে চায়নিজ পিস্তল। ওদের দলের জিয়া নামের এক তরুণ আগে থেকে তাকে চিনত। তিনি চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড লে. ফজলুল কবির। নিজেদের উদ্দেশ্যের কথা তুলে ধরে লে. কবিরের সহায়তা চাইল এই পাঁচ তরুণ। তাদেকে মতিনগর ক্যাম্পে কী নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে কিনা জানতে চাওয়া হলো? লে. কবির এ প্রস্তাবে খুশিই হলেন। এভাবেই সন্ধ্যার মধ্যেই ২ নম্বর সেক্টরের সদর দপ্তরে পৌঁছে গেল পাঁচজন। সেখানে পরিচয় হলো দাঁড়িওয়ালা ছোটখাটো মানুষ ক্যাপ্টেন মাহবুবের সাথে। ২ নম্বর সেক্টরের দ্বিতীয় প্লাটুনে যোগ দিতে বলা হলো তাদের– এর মধ্যে ঢাকাসহ বাংলাদেশের অন্যান্য স্থান থেকেও অনেক তরুণ পৌঁছে গেছে, তাদের নিয়ে প্রথম প্লাটুন গঠন করা হয়েছে। পটাঁচ তরুণের জায়গা হলো দ্বিতীয় প্লাটুনে। এ প্লাটুনের নির্ধারিত তাঁবুতে ঢুকে তারা আরও কয়েকজন তরুণের দেখা পেলেন। এর মধ্যে জানা গেল, পরের দিন বেলা ২ থেকে ৩টার দিকে ২ নম্বর সেক্টরের প্রধান এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের চতুর্থ ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার মেজর খালেদ মোশাররফ আসবেন।

মতিনগর মানে মুক্তার শহর। টিলাময় অঞ্চলটি প্রাকৃতিকভাবেই যেন সৃষ্টিকর্তা মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে বানিয়েছেন।

পরদিন ঘুম ভাঙে সেনাজওয়ানদের হাকডাকে। প্রাতঃকালীন শরীরচর্চার পর তাদের নাশতা দেওয়া হয়। চাপাতি ও নানের মাঝামাঝি একধরনের রুটি। সাথে কয়েক রকমের সবজি। স্বাভাবিক অবস্থায় এ সবজি কেউ হয়তো মুখেই তুলত না। এ ছাড়া মগভর্তি দুধছাড়া মজাদার গরম গরম চা-ও ছিল সাথে। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে হাবিবুল আলমের দল সাথে সানকি নিয়ে এসেছিল।

খালেদ মোশাররফ আসার আগেভাগে ছাত্র প্লাটুনের সবাইকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হয়। একটা গাড়ি এসে থামল: গাড়ির দরজা খুলে দিল একজন সিপাই। নামলেন ফর্সা, দীর্ঘদেহী এবং সুদর্শন ব্যক্তি। ক্যাপটেন মাহবুব তাকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে সব তরুণ হাততালিতে ফেটে পড়ে। খালেদ মোশাররফ তাদের হাততালি দিতে নিষেধ করে বাংলা এবং ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলতে শুরু করলেন। কেন তরুণদের দরকার, কীভাবে লড়াই চালিয়ে নেবেন। পাকিস্তান সরকারের সাথে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক–তিন ক্ষেত্রে লড়াই করবেন, জানালেন। একযোগে এ যুদ্ধ চলবে। যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য ঢাকাসহ অন্যান্য জেলা থেকে আগত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, ২ নম্বর সেক্টরে গেরিলা যুদ্ধ চালানোর জন্য সবাইকে সাহস এবং দৃঢ় মনোবল থাকতে হবে। তবে এ-ও জানান, দেশের অর্থনীতি যেন পঙ্গু হয়ে না যায়। গভীর ভাবনাচিন্তা করে পদক্ষেপ নিলেই কেবল এটি সম্ভব। কোন কোন স্থানে ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালালে রক্তপিপাসু শাসনের অবসান ঘটবে। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানগুলো যেন পুনর্গঠনের অবস্থা থাকে। তিনি আরও জানান, দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করেছে এবং বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছে। এ ছাড়া প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু কর্মকর্তা ও সেনা, ফ্রন্টইয়ার ফোর্স রেজিমেন্টের বাঙালি কর্মকর্তা, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর) এবং ইস্ট পাকিস্তান পুলিশ বাহিনীও এর মধ্যে যোগ দিয়েছে এবং একযোগে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রশিক্ষণ চলছে।

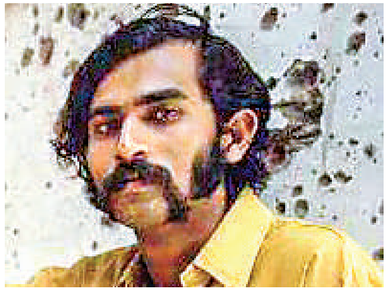

হাবিবুল আলম।

দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করেছে এবং বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছে। এ ছাড়া প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু কর্মকর্তা ও সেনা, ফ্রন্টইয়ার ফোর্স রেজিমেন্টের বাঙালি কর্মকর্তা, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর) এবং ইস্ট পাকিস্তান পুলিশ বাহিনীও এর মধ্যে যোগ দিয়েছে এবং একযোগে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

হাবিবুল আলমের মতো প্রথমবার মেজর খালেদের বক্তব্য শুনে তাদের মনে প্রশ্নের ঝড় ওঠে অনেকেরই। প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে থাকে মাথায়: এখন কী হবে? যুদ্ধ চলবে কত দিন? আমরা বাঁচতে পারব? আর কখনো কি মা-বাবা বা প্রিয়জনদের দেখতে পাব?

৫৫৫ সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে মাও সে-তুংয়ের কথা তুলে ধরেন মেজর খালেদ, কোনো সরকারই জীবিত গেরিলাকে চায় না। কাজেই কী ঘটবে বা যুদ্ধ শেষে সরকারের আচরণ কী হবে, সে বিষয় খালেদের পক্ষে কিছুই বলা সম্ভব নয়। বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার প্রশিক্ষণ নিতে হবে। প্রয়োজনে মহৎ কারণের জন্য প্রাণ দিতে তৈরি থাকতে হবে। ঢাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হবে এবং এ কারণেই ঢাকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণদের স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে। যুদ্ধে একবার জড়িয়ে পড়লে পিছু হটার পথ আর খোলা থাকবে না। সৈনিকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবে না ফিরে যাবে, সে সিদ্ধান্ত এখনই নিতে হবে। তার শেষ কথা ছিল, পর্যাপ্ত রেশন হয়তো জুটবে না। কিন্তু কেউ না খেয়েও থাকবে না। প্রথম এবং দ্বিতীয় প্লাটুনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ভার ক্যাপ্টেন এ টি এম

ক্যাম্পে।

হায়দারের ওপর ন্যস্ত হলো। শ্মশ্রুমণ্ডিত এ কর্মকর্তার বাঁ হাতে তখন স্লিং বাধা।

তরুণদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে নন-কমিশনড অফিসার বা এনসিওর একজনকে পাঠানো হলো। প্রথম শেখানো হলো .৩০৩ রাইফেল চালনা।

আলম খুঁজে বের করল ব্যাটালিয়ন হাবিলদার মেজর (বিএইচএম) কাসেমকে। প্রশিক্ষণে নিজে কেবল খুব ভালোই করেনি; বরং অস্ত্র সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতাও তুলে ধরেছে আলম। সেনা পরিভাষায় কোখ নামে পরিচিত অস্ত্রাগারে ঢোকার অনুমতি আদায়ের জন্যেই বিএইচএমকে দরকার। কোখে অস্ত্র পরিষ্কারের কাজে নিয়োজিত সৈনিকদের সহায়তা করতেই সেখানে ঢুকতে চাই আলম। শেষ অবধি এ অনুমতি দেওয়া হলো শর্ত সাপেক্ষে। কোনো রকম শর্ত বা আইন ভঙ্গ হলে কঠোর শাস্তি হিসেবে আলমকে কোয়ার্টার গার্ডে পাঠানো হবে। অল্পকথায় জানিয়ে দেয় কোথের দায়িত্ব থাকা ব্যক্তি এম এম ইদ্রিস।

প্রতিদিন দুপুরের খাওয়ার পর কোখে যাওয়া শুরু করল আলম। সেখানে অস্ত্র পরিষ্কার করার পাশাপাশি অস্ত্র খুলে আবার জোড়া দেওয়ার কাজ আগেভাগেই শিখে নিল। এক বা দুই সপ্তাহের মধ্যেই সব ধরনের খুদে এবং বহনযোগ্য অস্ত্র সম্পর্কে জানাশোনা হয়ে গেল তার। বিশেষ করে চায়নিজ সাব মেশিনগান বা এসএমজি, চায়নিজ ৭.৬২ রাইফেল, জিও রাইফেল, .৩০৩ এলএমজি, চায়নিজ এলএমজি মতো লাইট মেশিনগান বা এলএমজি, পুরোনো কালের, প্রথম মহাযুদ্ধের আমলের ভিকার্স এলএমজি তখনো ব্যবহার হতো, সে সম্পর্কে হাতেকলমে জানা হয়ে যায়। এ ছাড়া কোন অস্ত্রে কোন ধরনের গোলাগুলি ব্যবহার হয়, তা-ও জানা হয়ে গেল। পাশাপাশি ট্রেসার বুলেট সম্পর্কেও ধারণা হলো।

যুদ্ধের অস্ত্র নিয়ে কথা বলতে গিয়ে হাবিবুল আলম বলেন, সব পুরোনো অস্ত্র দিয়ে আমাদের যুদ্ধ করতে দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে বড় জ্বালিয়েছে ভারতীয় এসএলআর।

গুলি আটকে যেত? প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তা তো বটেই, এমনকি পানিতে নল বাঁকা হয়ে যেত।

ক্যাপ্টেন হায়দার থেকে শুরু করে সব প্রশিক্ষকই প্রশিক্ষণের নানা পর্বে বারবার বলেন, কোনোভাবেই একটাও বুলেট অপচয় করা যাবে না।

কুমিল্লায় মোতায়েন পাকিস্তানের তৃতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়নের এসএসজি কর্মকর্তা ছিলেন ক্যাপ্টেন এ টি এম হায়দার। তিনি সিলেটের তেলিপাড়া থেকে মেজর খালেদের চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দেন। কাকুলে পাকিস্তানের সামরিক একাডেমিতে হায়দারের ইন্সট্রাক্টর ছিলেন মেজর খালেদ। যুদ্ধ চলাকালীন আলমদের সতীর্থরা তাকে হায়দার ভাই বলেই ডাকত। তার অধীনে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সবার সাথেই হায়দারের বন্ধুত্বের সম্পর্ক। সেক্টর-২-এর সব গেরিলা তৎপতার দায়িত্ব ছিল তার ওপর। পদাতিক বা গোলন্দাজ বাহিনীর কর্মকর্তাদের সাথে হায়দারের আচরণের তফাৎ যে কারও চোখেই পড়ত। হায়দার তার মিষ্টি আচরণের মধ্য দিয়ে সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে ওঠে। ফলে তার আওতায় প্রশিক্ষণরত গেরিলারা আলাপ করে আরাম পেত। তেলিপাড়া চা-বাগানে এক দুর্ঘটনায় তার বাঁ হাত ভেঙে গিয়েছিল।

বিস্ফোরক ব্যবহার নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই হায়দারের ওপরই বর্তায়। যুদ্ধের সবচেয়ে বিপজ্জনক এবং গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটির ব্যবহার কৌশল সহজভাবেই শেখাতেন তিনি। সব প্রশিক্ষণার্থী যেন ব্যবহার কৌশল রপ্ত করতে পারে, সে জন্য একে আকর্ষণীয় এবং সরলভাবেই উপস্থান করতে দ্বিধা করতেন না। বিস্ফোরক পাতা, ডিটোনেটর বসানো, প্রাইম কর্ড এবং চার্জ বসানো নিয়ে প্রশিক্ষণ ছিল হাতে-কলমে। স্বাভাবিক অবস্থায় যেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ লাগে, সেখানে ক্যাম্পে এক বা বড়জোর দুই দিনে সে পর্ব শেষ করা হতো।

প্রশিক্ষণ পর্বটি কী খুব কঠিন মানে নিষ্ঠুর ছিল?

জবাবে হাবিবুল আলাম জানান, প্রশিক্ষণ 'নিষ্ঠুর' হওয়াই উচিত। বোর্ডে লিখে তত্ত্ব পড়ে বোঝানো বা জানানোর মতো সময় তখন আমাদের ছিল না। সবই মাঠপর্যায়ে হাতে-কলমে শেখানো হয়েছে। এ সময়ে গিবনের রাইজ অ্যান্ড ফল অব দ্য রোমান এম্পায়ারের কথা আসে। গিবন রোমকদের প্রসঙ্গে বলেছেন, 'দেয়ার ড্রিল ওয়াজ ব্লাডলেস ওয়ার। দেয়ার ওয়ার ওয়াজ আ ব্লাডি ড্রিল।'

এরই মধ্যে একবার আলমকে ঢাকা যেতে হয়। মেজর নুরুল ইসলামের (শিশু) স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে আসার জন্য ঝুঁকি নিতে হয়। এই অভিযানে আলম তার সঙ্গীকে নিয়ে ওঠে দিলু রোডের নিজের বাসায়।

মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার পর ওই প্রথম পরিবারের সাথে আলমের দেখা। ছেলেকে দেখে ঘোমটায় আধা ঢাকা মায়ের চোখে আনন্দঅশ্রু নামে। মা চোখের পানি গোপন করার চেষ্টা করে সুবিধা করতে পারেনি। পরিবারের সাথে সঙ্গীকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলে তাকেও সাদরে গ্রহণ করা হয়।

ছোট দুই বোন রেশমা ও শাহনাজ অনেক প্রশ্ন করে। বড় বোন আসমা, কয়েক মাস আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে এমএসসি পাস করেছে। ঢাকায় ফেরার কারণ জানতে চাইল আসমা। টনি ভাবিকে নিয়ে যেতে হবে এবং আজ রাতেই ফিরতে হবে। আলমের জবাব। বাবা ইঞ্জিনিয়ার হাফিজুল আলম কোনো প্রশ্ন করল না। শুধু জানাল, তোমাদের দুজনের যাতায়াতের জন্য গাড়ি-টাড়ি হয়তো লাগবে। ওই যে ড্রাইভারসহ গাড়িটা রইল। নিজের লাল রঙের দুই দরজার ট্রাম্প হেরাল্ডকে দেখাল।

আলমের এ অভিযান সফল হয়। নুরুল ইসলাম শিশুর স্ত্রীকে নিয়ে ক্যাম্পে ফেরার পর পূর্বপ্রতিশ্রুতি মোতাবেক চায়নিজ এসএমজি আলমকে দিয়ে দেন। শিশু তার চায়নিজ পিস্তলটি দেন তার সঙ্গীকে।

এভাবেই হাবিবুল আলমের হাতে চলে আসে চায়নিজ এসএমজি। হাতে যেন চাঁদ পেয়েছে এমনটিই মনে হয় ১১১ নম্বরযুক্ত এসএমজি পেয়ে। আগস্টের আগে চায়নিজ অস্ত্র বিশেষ করে এসএমজি ছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের দেওয়া হয়নি।

মেজর খালেদ মোশাররফের আদেশে আলমের নেতৃত্বে গেরিলাদের একটি দলকে শহরের বুকে অভিযান চালানোর জন্য ঢাকায় পাঠানো হলো। বিশ্বব্যাংক এবং জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খানের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলে তুলে ধরার চেষ্টা করছে ইসলামাবাদ সরকার। তাদের এ তৎপরতা ভন্ডুল করে দেওয়াই হবে এই গেরিলা অভিযানের উদ্দেশ্য। অভিযান চালাতে হবে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। অভিযানের দলপতির দায়িত্ব দেওয়া হলো আলমকে। আর দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড বেছে নেওয়ার এখতিয়ার বর্তাল তারই ওপর। শহিদকে এ জন্য বেছে নেওয়া হলো। অভিযান সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেওয়ার সময় বারবার বলা হতো, পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে মুখোমুখি লড়াইয়ে যাওয়া যাবে না। অপর্যাপ্ত অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ নিয়ে সুশিক্ষিত বাহিনীর বিরুদ্ধে এ ধরনের যুদ্ধে জড়ালে ফল ভালো হবে না। অভিযানের জন্য গেরিলা দলকে হ্যান্ড গ্রেনেড এবং বেয়নেট কেবল সরবরাহ করা হবে। দলটির কাজ হবে দূর থেকে হোটেলের সুনির্দিষ্ট এলাকায় গ্রেনেড ছুড়ে মারা।

বিশ্বব্যাংকের দল এবং ইউএনসিএইচআরকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে ঢাকা নগরীর জীবনব্যবস্থা স্বাভাবিক নয়। নগরীকে পাকিস্তানি বাহিনী পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণও করতে পারছে না। প্রথম অভিযানে এ দলে ১৭ জন গেরিলা ছিল। অভিযানের নাম দেওয়া হলো অপারেশন হোটেল ইনটারকন্টিনেন্টাল–হিট অ্যান্ড রান।

দলের সবাইকে আনারসের মতো দেখতে, তবে আনারসের তুলনায় ছোট, ইন্ডিয়ান গ্রেনেড পাঁচ থেকে ছয়টা করে দেওয়া হলো। আর দেওয়া হলো দুই ধরনের বেয়নেট। অভিযান শেষে ফিরতে পারলে বেয়নেট জমা দিতে হবে। জুন মাসের ৩ তারিখে দলটি পৌঁছাল সওয়ারি ঘাটে। সেখান থেকে আগেই ঠিক করা নিজ নিজ গন্তব্যে চলে গেল সবাই। আলম দলের মোফাজ্জেল হোসেন মায়া এবং জিয়াকে জানাল সন্ধ্যায় যেন তার সাথে যোগাযোগ করে। মায়া জানাল, সেগুনবাগিচার মিউজিক কলেজে তাকে পাওয়া যাবে। অন্যদিকে জিয়া বলল যে সন্ধ্যায় সে নিজেই দেখা করবে।

মুনির চৌধুরীর ছেলে ভাষণ এ গেরিলা দলে ছিল। সে জানাল যে তার চাচা বাদল চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনের ক্যামেরাম্যান এবং দক্ষ গাড়িচালক বাদল ভাই তাদের অভিযানে যোগ দিতে চায়। আলম এ প্রস্তাবে রাজি হলো।

অভিযানের জন্য গাড়ি গুলশান থেকে ছিনতাই করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। প্রথম দিন ব্যর্থ হলো। তৃতীয় দিন একটি ডাটসন গাড়ি ছিনতাই করা হলো। ছিনতাই করার পর গাড়িটি চালাচ্ছিল বাদল ভাই। গাড়ি নিয়ে আসার পথে টের পাওয়া গেল যে ডাটসনের চালক তাদের চিনে ফেলেছে। উপায়? জিয়া জানাল যে তাকে খসিয়ে দিতে হবে। গুলশান ও তেজগাঁও শিল্প এলাকার মাঝামাঝি একটা কালভার্টের নিচে নিয়ে তাকে খসিয়ে দেওয়া হলো।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে ডাটসান নিয়ে অভিযানে চলল গেরিলা দলটি। চালকের আসনে ছিল বাদল ভাই। স্বপন সামনের আসনে পিস্তল হাতে বসল। মায়া এবং আলম বসল পেছনের বাঁ ও ডান দরজার কাছে। আর মাঝে রইল জিয়া।

হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের রাস্তার মাঝামাঝি আসতেই শুনতে পেল সাইরেনের শব্দ। পুলিশি এসকর্টে কয়েকটি গাড়ি ময়মনসিংহ সড়কের দিক থেকে আসছে। বহরের সবার সবার পেছনে রয়েছে সাদা শেভ্রোলে। গেরিলা দলটির বুঝতে বাকি রইল না, এ গাড়িতেই রয়েছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সেসব অতিথি। যাদের কাছে পরিস্থিতি তুলে ধরার জন্য তাদের ঢাকা পাঠানো হয়েছে। বাদল ভাই তাদের গাড়িকে মিন্টো রোডের শেষ মাথা থেকে ইউটার্ন করিয়ে হোটেলের ছোট প্রবেশদ্বারের কাছে নিয়ে এল। ফুটপাতের সাথে লাগোয়া এ দ্বার দিয়ে পথচারীরা সরাসরি হোটেলে ঢুকতে পারে। দেয়ালের ওপর এবং ওই এলাকার আশপাশে বেশ কিছু মানুষ জড়ো হয়েছিল। গাড়িবহর দেখার সাথে সাথে তারা হাততালি দিতে শুরু করল। ডাটসান গাড়ির দিকে কেউই তাকানোর প্রয়োজনই অনুভব করল না। গাড়ি থেকে চারজন দ্রুত নেমে এসে প্রবেশদ্বারের পেছনের মানুষজনের সাথে মিশে দাঁড়িয়ে রইল। জিয়া, মায়া এবং আলম তিন চার ফুট দূরে দূরে দাঁড়াল। স্বপন পকেটে ডান হাত পুরে খাড়া রইল। ওর পকেটেই ছিল পিস্তল। আলমদের কভার দেওয়াই ছিল ওর দায়িত্ব। কিন্তু ওরা তখনো জানতই না যে পিস্তলের মতো ক্ষুদ্র অস্ত্র দিয়ে কভার দেওয়া যায় না।

আলম গ্রেনেডের পিন খুলতে খুলতেই জিয়া তার গ্রেনেড ছুড়ে দিয়েছে। শেভ্রোলে মাত্র এসে দাঁড়িয়েছে। দুজন গাড়ি থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করছে। দ্বিতীয় গ্রেনেডটি ছুড়ল আলম। শেভ্রোলের দরজার কাছে ওটা আছড়ে পড়ল। মায়ার ছোড়া তৃতীয় গ্রেনেডও প্রায় একই জায়গায় পড়ল। জিয়া দ্বিতীয় গ্রেনেড ছুড়ল ওই গাড়িকে তাক করে। এটা পাশের জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। গ্রেনেডগুলো একের পর এক ফাটতে শুরু করল। ভারী শেভ্রোলে গাড়িটি ৩ থেকে ৪ ফুট ওপরে উঠে গিয়ে ঠাস করে পড়ল।

হোটেলের কাছে যারা জড়ো হয়েছিল, প্রথমবার চাক্ষুষ করল যে সরকারের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধদের হামলার সাহসী দৃশ্য। দলটি আর দেরি করল না। আতঙ্কিত মানুষদের কাণ্ডকারখানা দেখার জন্য অপেক্ষা না করেই ডাটসনে চেপে বসল। বাদল ভাই গাড়িটি ছুটিয়ে নিয়ে চলল গন্তব্যে। ফেরার পথে সরকারি দৈনিক মর্নিং নিউজে গ্রেনেড হামলা চালাল। দুটো গ্রেনেড ছুড়ল। দুটিই দৈনিকটির দপ্তরের উঁচু প্রাচীরের ওপর দিয়ে গিয়ে ভেতরে পড়ে। এ ছাড়া মগবাজার কাজি অফিসের কানাগলিতে অবস্থিত জামায়াত নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের বাড়িতে দুটো গ্রেনেড ছোড়া হয়। ও দুটোও বাড়ির প্রাচীরের ওপর দিয়ে ভেতরে গিয়ে পড়ে।

অভিযান শেষ। মায়া এবং জিয়াকে নিয়ে পরদিন ঢাকা ছাড়ে আলম। আলমের বাবা ১০ জুন ওদের তিনজনকে নিজ গাড়িতে করে নারায়ণগঞ্জ গুদারা ঘাট পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। নদী পার হয়ে ওরা হাঁটতে শুরু করে। একটা মসজিদে রাতে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া ছাড়া রাস্তায় কোথাও এক মুহূর্তের জন্য থামেনি। তবে ঝাঁকে ঝাঁকে মশার কামড়ে বীর গেরিলাদের বিশ্রামের আশা বরবাদ হয়ে যায়।

রাত ১১ বা ১২টা নাগাদ মতিনগর ফেরে ত্রিরত্ন। ক্যাপ্টেন এ টি এম হায়দার এবং শহীদুল্লাহ খান বাদলের কাছে জানায় নিজেদের ফিরে আসর কথা। মেজর খালেদ মোশাররফকেও জানানো হলো তাদের কথা। এর আগেই বিবিসি এবং অল ইন্ডিয়া রেডিওর কল্যাণে ঢাকার সফল ঘটনা তাদের জানা হয়ে গেছে।

এরপর, পরবর্তী অভিযানের জন্য চলতে থাকে প্রশিক্ষণ।

১৯ জুলাই ঢাকার পাঁচটি উপবিদ্যুৎকেন্দ্রে একযোগে গেরিলা হামলা হয়। পাকিস্তানি বাহিনীর জন্য যা বড় রকম মাথাব্যথা হয়ে

দেখা দেয়। এর আগে গেরিলা দলকে ঢাকায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর আগে মেলানগরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের। এবারে ঢাকায় ঢোকার জন্য মুরাদনগরের পথ ব্যবহার করে। ঢাকায় হোম ইকোনমিকস কলেজের কাছে একটি পেট্রলপাম্প উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা পুরোপুরি সফল হয়নি। গ্রেনেড ঠিকভাবে না বসানোর কারণে পেট্রলপাম্পের মাটির তলের তেলের ট্যাংকে আগুন না ধরে বরং পাশের হোম ইকোনমিকস কলেজের দক্ষিণের দেয়ালের সবটাই ধসে পড়ে।

এরপরই পাঁচ উপবিদ্যুৎকেন্দ্রে একযোগে গেরিলা হামলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতে দুই কেন্দ্র অচল করে দেওয়া যায়, তিনটাতে হামলা ঠিক সফল হয়নি। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, রাজাকারদের সতর্কতার কারণে সফল হওয়া যায়নি। উলান বিদ্যুৎকেন্দ্র সফলভাবে উড়িয়ে দেওয়া গেরিলা দলের নেতৃত্ব দেয় গাজী গোলাম দস্তগীর। গুলবাগে দ্বিতীয় বিদ্যুৎকেন্দ্র উড়িয়ে দেওয়ার দলের নেতৃত্বে ছিল আবু সাঈদ খান। এই অভিযানের সময়ই চায়নিজ এসএমজি ব্যবহার করা হয়। ঢাকায় গেরিলাদের বিদেশি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্যবহারের বিষয়টি আন্তর্জাতিক খবরে গুরুত্ব পায়।

মোহাম্মদপুর এলাকায় বাঙালিদের বিহারি নামে পরিচিত অবাঙালিরা মারধর করত। তাদের শিক্ষা দেওয়ার ঘটনা বলেন হাবিবুল আলম। এ ঘটনার বর্ণনা ব্রেভ টু হার্টে বইয়েও দেওয়া আছে। ইকবাল বা আরঙ্গজেব রোডে জর্দার কৌটা পেতে রাখা হয়। এটি একধরনের প্লাস্টিক মাইন। বিস্ফোরণে পা উড়ে যেতে পারে। কিংবা উড়ে যেতে পারে গাড়ির চাকা। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গাড়ির চাকা এভাবে উড়ে যাওয়ার পর রাস্তার দুই পাশের সব বাসা থেকে অবাঙালিদের রাস্তায় নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে রাখে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। তাদের মারধরও করে। অবশ্য সকাল পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে রেখে তারপর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

প্লাস্টিক মাইনের চেহারার সাথে জর্দার কৌটার মিল থাকায় এগুলো ওই নামে পরিচিতি পায়। সাক্ষাৎকারের এ পর্যায়ে জানতে চাওয়া হয় যে জুতার কালির কৌটার মতো দেখতে? না না। বলেন বীর প্রতীক হাবিবুল আলম। তিনি জানান, জুতার কালির কৌটা বেশি চিকন। প্লাস্টিক মাইনের কৌটা অত চিকন নয়। জর্দার কৌটার মতোই মোটা।

এবারে আরেক ধাপ এগিয়ে ফার্মগেটের মোড়ে সেনা চেকপোস্টের ওপর হামলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশি দারুল কাবাবে হামলার সিদ্ধান্তও হয়। দারুল কাবাবে পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তারা কাবাবের স্বাদ নিতে আসতেন। ফার্মগেটের কাছাকাছি হওয়ায় আলমের নেতৃত্বাধীন গেরিলা দলটি নিজেরাই একই দিনে দুই জায়গায় হামলার সিদ্ধান্ত নেয়। ৯ আগস্টে দুপুরের পর নিশ্চিত হওয়া যায় যে গত রাতে এ অভিযান চলেছে ৯২ সেকেন্ড। ৯২ সেকেন্ডের অভিযানে ব্যবহৃত হয়েছে ৯৬ রাউন্ড গুলি। অভিযানে চেকপোস্টের ১২ পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়।

ফার্মগেটে অপারেশন শেষে গ্রেনেড ফাটিয়ে সরে পড়বে গেরিলারা। দারুল কাবারের কাছে ওত পেতে থাকা গ্রেনেডের আওয়াজ পাওয়ার সাথে সাথে দ্বিতীয় গেরিলা দলটি তখনই তাদের অভিযানে নামবে। আগেই ঠিক করা ছিল। কিন্তু ইন্ডিয়ান গ্রেনেড ছোড়া হয়েছিল ঠিকই কিন্তু ওটা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, ফাটেনি। সংকেত না পেয়ে দারুল কাবাবে হামলার দায়িত্বে মোতায়েন দলটি পরে ওখান থেকে সরে যায়।

এ অভিযানের পরিকল্পনা চট করে নেওয়া নয়। খুঁটিনাটি অনেক কিছু খতিয়ে দেখা হয়েছে বারবার। মাসখানেক ধরে রেকি করতে হয়েছে গেরিলাদের। অভিযানে নামার দিনেও ঝামেলা হয়েছে। সেদিন চায়নিজ এসএমজি পরিষ্কার করতে গিয়ে পুল থ্রু ভেতরে

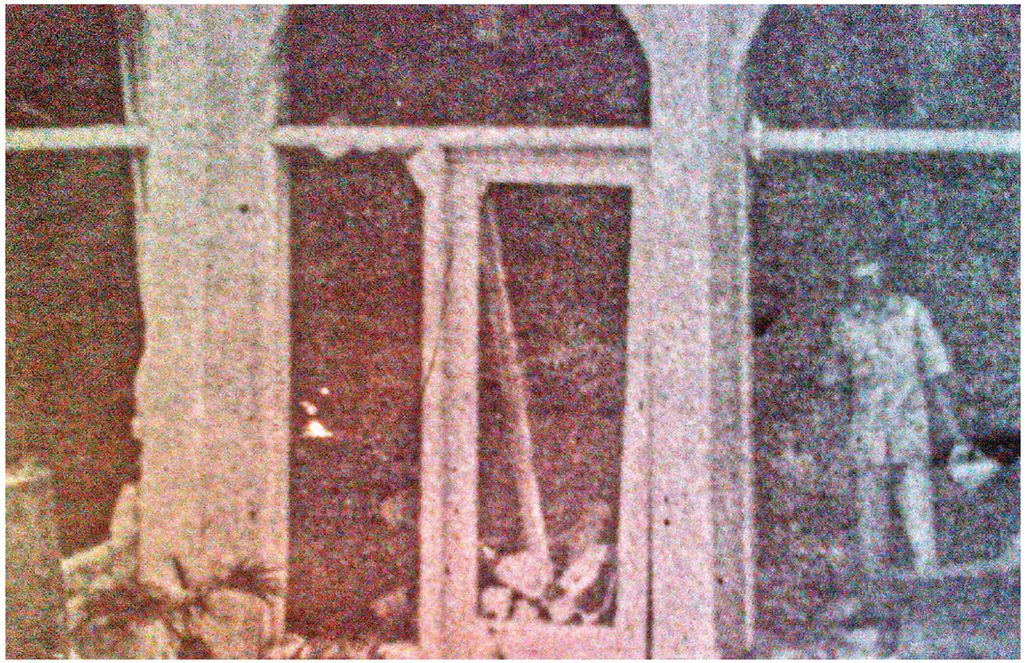

এর মাত্র তিন দিন পরই ঢাকার আকাশে বাংলাদেশের পতাকা ভাসতে দেখা যায়। এভাবে পতাকা ওড়ানোর পরিকল্পনা প্রথম মাথায় আসে শাহাদত চৌধুরীর। পতাকার কাপড় ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে কেনা হয়েছে। কেউ যেন কিছু সন্দেহ করতে না পারে, সে জন্যই এই সতর্কতা।

আটকে যায়। কোনোভাবেই ছোটানো যাচ্ছিল না। এদিকে অভিযানে নামার সময় এগিয়ে আসছে। টানাটানি করে কোনো কাজেই হচ্ছে না। জন্মের মতো মনে হয় আটকে গেছে ওটি। শেষ পর্যন্ত কেরাসিন তেল ঢেলে আগুন দেওয়া হয়। পুল থ্রুর কাপড় এতে পুড়ে যায়। ধাতব দণ্ডটি বের করে আসতে তেমন বেগ পেতে হয়নি। ঘাম দিয়ে জ্বর সারল আলমসহ সবার।

ফার্মগেটের অভিযান চালানোর আগে ভালো করে জেনে নেওয়া হলো ওই এলাকার কোন দোকান কখন বন্ধ হয়, কে কখন আসে-যায়, এসবই খতিয়ে দেখা হলো, অন্তত মাসখানেক রেকি চলে।

হলিক্রস স্কুলের তেতলা ভবনের প্রান্ত থেকে একজন নান এই অভিযান প্রায় পুরোটাই প্রত্যক্ষ করেন। অভিযানের পর তার ভাই জানান এ কথা। এই নান এতই উত্তেজনা অনুভব করেন যে সারা রাত ঘুমাতে পারেননি। রাতে নিজেদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ফার্মগেটের চেকপোস্ট থেকে নিহত সতীর্থ সেনাদের সরিয়ে নিতে আসেনি পাকিস্তানি বাহিনী। দিনের আলো ফুটলে এগিয়ে আসে তারা। তখন ১২টি লাশ সরিয়ে নিয়েছে, তা দেখতে পান ওই নান। তিনি বুকে ১২ বার ক্রস চিহ্ন এঁকে নিহতের সংখ্যাটা জানিয়ে দেন।

এদিকে একই মাসের ১১ তারিখে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের বার সাকিতে বোমা ফাটায় গেরিলারা। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রায় নাকের নিচেই এটি ফাটানো হয়। সুপরিকল্পিত এ অভিযান বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘ পরিকল্পনা করতে হয়েছে। আলমসহ চারজন গেরিলা হোটেলটিতে একাধিকবার যাতায়াত করে। সাকি বারের ভেতরের টয়লেটও ব্যবহার করে। বিস্ফোরক কোথায় বসানো যায়, সাকির কমোডে বসেই আলমের মাথায় বিদ্যুৎ খেলে যায়, কেন এই কমোডেই তো বোমা পেতে রাখা যায়। সেই পরিকল্পনা ধরেই এগোয় সব তৎপরতা।

সুইস এয়ারের কর্মকর্তা জানতে বা অজান্তে বেশ সহায়তা করেছে গেরিলা দলকে। তার দপ্তরে ব্রিফকেস নিয়ে বারবার আসা-যাওয়া করে হোটেল এলাকায় যাতায়াতের বিষয় স্বাভাবিক করে তোলা হয়। পরে এক মুক্তিযোদ্ধা ২৫ পাউন্ড পিইকে বিস্ফোরক বোঝাই ব্রিফকেস পেতে রাখে সাকির টয়লেটের এক কমোডে। টয়লেট থেকে বের হয়ে আসার পর মনে পড়ে যে টাইমার চালু করতে ভুলে গেছে। দ্রুত আবার ফিরে যায়। কিছু ফেলে এসেছে এমন ভাবসাব করে। খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজির ভান করে। তারপর চট করে টয়লেটে ঢুকে ওই টাইমার চালু করে বের হয়ে আসে দ্রুত।

বিস্ফোরণ ঘটে হোটেলের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এলাকার মধ্যেই। যার শব্দ কাওরান বাজার থেকে শোনা গেছে। শোনা গেছে রাজারবাগ পুলিশ লাইনস থেকেও।

এর মাত্র তিন দিন পরই ঢাকার আকাশে বাংলাদেশের পতাকা ভাসতে দেখা যায়। এভাবে পতাকা ওড়ানোর পরিকল্পনা প্রথম মাথায় আসে শাহাদত চৌধুরীর। পতাকার কাপড় ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে কেনা হয়েছে। কেউ যেন কিছু সন্দেহ করতে না পারে, সে জন্যই এই সতর্কতা।

রাতদিন খেটে কয়েকজন তরুণী তিন শ পতাকা তৈরি করে। নগরীর কোন কোন স্থান থেকে পতাকা ওড়ানো হবে, তা আগেই আলম এবং আরেক মুক্তিযোদ্ধার সাথে আলোচনার মাধ্যমে শাহাদত চৌধুরী ঠিক করে দিয়েছিল। সে অনুযায়ী ১৪ আগস্ট সকাল ৯ থেকে সাড়ে ৯টার মধ্যে ঢাকার আকাশে পতাকা উড়তে শুরু করে।

ক্র্যাক প্লাটুনের ১৭ ডিসেম্বরের তৎপরতা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। নারিন্দা এলাকায় কিছু পাকিস্তানি স্লাইপার লুকিয়ে রয়েছে। তাদের নিকেশ করার তৎপরতায় ব্যস্ত ছিল আলমসহ অন্যরা। সে সময় জরুরি বার্তা নিয়ে আসে দুই মুক্তিযোদ্ধা। আলম তাদের কাছ থেকে জানতে পারে, মিত্র বাহিনী হিসেবে পরিচিত ভারতীয় বাহিনী সেদিন বাংলাদেশ রেডিও ভবনের নিয়ন্ত্রণ নেবে। সকাল সাড়ে ৮টায় ঢাকায় মোতায়েন ভারতীয় সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে সবচেয়ে পদস্থ ব্যক্তি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ঘোষণা ঢাকা রেডিও থেকে দেবে। এ খবরে আলমের মেজাজ তেতে উঠল। বিদেশি সেনা নিজ দেশের মাটি থেকে দেশ স্বাধীন হওয়ার ঘোষণা দেবে–এর চেয়ে অবমাননাকর এবং লজ্জার আর কী হতে পারে! নির্বাসিত বাংলাদেশ সরকার বা সেক্টর ২-এর পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেওয়ার মতো কেউ কি নেই? ভারতীয়দের এ নকশা কার্যকর হতে দেওয়া যাবে না।

এটা হতে পারে না। আলম ভাবল। বন্ধ একটা চায়ের দোকানের সামনে বসে চিন্তাভাবনা শুরু হলো। যেভাবেই হোক এটা ঠেকাতে হবে। ঢাকায় তখন সেক্টর ২-এর ভারপ্রাপ্ত প্রধান (যুদ্ধ চলাকালে আইন মেনে সেনাবাহিনীতে পদোন্নতি হয়েছে) মেজর এ টি এম হায়দার ছাড়া আর কেউ নেই। লে. কর্নেল সফিউল্লাহ নারায়ণগঞ্জ বা ঢাকার কোথাও হয়তো আছেন। তার সাথে যোগাযোগ নেই। গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের পর যৌথ কমান্ডের সাথে কলকাতা চলে গেছেন। সব মিলিয়ে অবস্থা দাঁড়াচ্ছে হয় হায়দার ভাইকে খুঁজে বের করতে হবে। স্বাধীনতার ঘোষণা তাকে দেওয়ার জন্য রাজি করাতে হবে। আর না হয় ঢাকা বেতারকেন্দ্র এমনভাবে ভাঙচুর করতে হবে, যেন ঢাকায় ইন্ডিয়ান

আর্মির সবচেয়ে পদস্থ কর্মকর্তা ঘোষণা না দিতে পারেন।

রাস্তায় পরিত্যক্ত একটা টয়োটা গাড়ি পাওয়া গেল। আলমের চেষ্টায় গাড়িটাকে সচল করা হলো। হাটখোলায় এক বন্ধুর বাড়িতে মেজর হায়দারের রাত কাটানোর কথা। তার বন্ধু ফতেহকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল ফতেহর এক বন্ধুকে। যেভাবেই হোক ফতেহ ও হায়দারকে খুঁজে বের করো, তাকে বলা হলে। এবং এক ঘণ্টার মধ্যে যেন তারা রেডিও অফিসে হাজির হয়।

রেডিও অফিস থেকে বলা হলো, রেডিওর সাবেক আঞ্চলিক পরিচালক শামসুল হুদা চৌধুরী একমাত্র ব্যক্তি, যিনি রেডিও স্টেশনকে চালু করতে পারবেন। রেডিওর সব কাজকর্ম তার কাছে হাতের তালু মতোই পরিচিত। ইস্কাটনে তার বাসাটা আলমের চেনা। সকাল সাড়ে পাঁচ বা ছয়টায় সে বাসায় হাজির হলো। খ্যাতনামা গায়িকা লায়লা আর্জুমান্দ বানু তাদের চমচম দিয়ে আপ্যায়ন করল। শামসুল হুদা চৌধুরীকে অস্ত্রের খানিকটা ভয় দেখিয়ে ঘটনা খুলে বলল আলম। সব শুনে শামসুল হুদা চৌধুরী রাজি হয়ে গেল। পাশাপাশি জানাল, মিত্র বাহিনীর কেউ আসলে তাকেও বলা হবে, রেডিও চালাতে ক্রিস্টালের প্রয়োজন এবং এ ক্রিস্টাল মিরপুরে পাওয়া যাবে বলে ঠেকানো যাবে। তখনকার দিনে রেডিও চালাতে ক্রিস্টালের প্রয়োজন হতো। এ ছাড়া রেডিও চালানো যেত না।

রেডিও অফিসে এসে দেখে মেজর হায়দার এবং শাহাদত চৌধুরীও এসেছে। এসেছে দুজন সাংবাদিকও। দোতালার কোনার কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো ক্যাপ্টেন হায়দার এবং শাহদত চৌধুরীকে। এর মধ্যে মিত্রবাহিনীর এক সেনা কর্মকর্তা রেডিও অফিসে এসে হাজির। শামসুল হুদা চৌধুরী চলে গেলেন আঞ্চলিক পরিচালকের কক্ষে। সেখানেই তাকে স্বাগত জানানো হলো। কয়েক মিনিট কথা বলার পর ভদ্রলোক হাসিখুশি মনে চলে গেল। শামসুল হুদা চৌধুরী বলল যে লে. কর্নেল পর্যায়ের ইন্ডিয়ান কর্মকর্তাকে বলা হয়েছে রেডিও স্টেশন মেরামত করতে অনেক সময় লাগবে। মেরামতের জন্য ক্রিস্টালের খোঁজে রয়েছে সবাই। ওসব কেবল মিরপুরেই পাওয়া যায়।

স্বাধীন হওয়ার ঘোষণা দেওয়ার তোড়জোর চলছে, সে সময় সাদেক হোসেন খোকার দল আওয়ামী লীগের দুই নেতা, নারায়ণগঞ্জের এমপি শামুসজ্জোহা এবং চট্টগ্রামের নেতা জহুর আহমেদ চৌধুরীকে নিয়ে উপস্থিত হলো। জহুর আহমেদ চৌধুরীকে চিনতই না আলম। তারা মেজর হায়দারের সাথে কথা বলতে চায় বলে জানাল। চালাকি করে তাদের ওই ঘরেই বসিয়ে রাখা হলো। তাদের দুজনকেই ব্যস্ত রাখার ফন্দি বের করা হলো। মেজর হায়দারের সাথে কী কী বিষয় কথা বলার ইচ্ছা আছে, তা যেন লিখে দেয়। জানানো হলো তাদের।

সকাল ৮:১০-এ বাংলাদেশ রেডিও চালু হলো। মেজর হায়দার ভাষণ দেওয়ার আগে বাংলায় অনুষ্ঠানের ঘোষণা করবে ফতেহ, ঠিক করা হলো। শান্ত ভঙ্গিতে মাইক্রোফোনের সামনে বসে রইল ফতেহ। কারিগরি বিভাগের একজন বাইরে থেকে ইশারায় দেখাল লাল আলো জ্বলে উঠেছে। অর্থাৎ এখন যা বলবে সবই বেতারে শোনা যাবে। অন এয়ারে যাবে। ফতেহ ঘোষণা করল, তারপরই ৮:১৫ মিনিটে মেজর এ টি এম হায়দারের কণ্ঠ বেতারে ছড়িয়ে পড়ল, ঘোষিত হলো–'দেশ মুক্ত হয়েছে এবং বাঙালিরা এখন এ দেশের স্বাধীন নাগরিক।' এরপর সব মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশবাসীরা নিরাপত্তার জন্য কিছু নির্দেশ দেওয়া হলো। তার ঘোষণা শেষ হওয়ার পরই আলম ও তার দলের যোদ্ধারা, ক্র্যাক প্লাটুনের গেরিলারা রেডিওর দায়িত্বভার খোকার দলের কাছে দিয়ে ওই স্থান ছাড়ল।

সেদিন দুপুরে আলমের সঙ্গী মুক্তিযোদ্ধা ফতেহ আলী চৌধুরী ফোন করল ঢাকা টেলিভিশনের পরিচালক এজাজ আহমদকে। ইংরেজিতে কথা বলার সময় নিজেকে মেজর হায়দারের স্টাফ অফিসার হিসেবে পরিচয় দিল। এর আগে শামসুল হুদা চৌধুরী এই ফোন করার পরামর্শ দিয়েছিল। এজাজ আহমেদ চৌধুরী প্রয়োজন মনে করলে রেডিও শামসুল হুদা চৌধুরীর সাথে কথা বলে নিতে পারে। জানানো হলো, বর্তমান পরিস্থিতি ভালোভাবেই বুঝিয়ে দেবে শামসুল হুদা চৌধুরী। যা হোক, সাড়ে চারটায় পূর্বকথামতো টেলিভিশন স্টুডিওতে পৌঁছে গেল ফতেহ, মুক্তিযোদ্ধা আফিকুর রহমান (টিপু) এবং অন্যরা। এর কয়েক মিনিট পর একটা খোলা জিপে হাজির হলো মেজর হায়দার, শাহাদত এবং আলম। ডিআইটি ভবনের প্রথম তলায় ছিল স্টুডিও। এর আগে কখনোই টিভি স্টুডিওতে যায়নি আলম।

একটি টেবিল ফ্যান বসানো হলো পতাকা দণ্ডের নিচে। পুরো গতিতে ফ্যান ঘোরানোর ব্যবস্থা করা হলো। সে বাতাসে পতাকাটা উড়তে থাকল পত পত করে। বিশাল স্টুডিও ক্যামেরায় উড়ন্ত পতাকার দৃশ্য ধারণ করা হলো। শাহাদত এবং অন্য কয়েকজন মিলে অনুষ্ঠান সূচি চূড়ান্ত করল। মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে তাতে সই করতে হলো আলম এবং ফতেহকে। এজাজ আহমদ টিভি প্রশাসনের পক্ষ থেকে সই করলেন। ফতেহ আলী চৌধুরী অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেবে বলে ঠিক করা হলো। এরপরই রেডিওতে স্বাধীন হওয়ার যে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, তাই দেবে মেজর হায়দার। সুদর্শন মুক্তিযোদ্ধা আফিকুর রহমান (গোপীবাগের টিপু) ইংরেজিতে একই ঘোষণা পড়বে।

অনুষ্ঠান তরতর করে সূচি ধরেই এগিয়ে গেল। সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে বের হয়ে এল আলম ও তার সাথিরা। ●

প্রতীকী।

এডওয়ার্ড কেনেডি।

দ্য টেস্টিমনি অব সিক্সটি

এম এ মোমেন

২৫ মার্চ ১৯৭১ সামরিক বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণের পর সাড়ে সাত কোটি মানুষের পূর্ব পাকিস্তান হয়ে উঠল অত্যাচার ও নির্যাতনের প্রধান সাক্ষী। সেনাশাসক ও তাদের সমর্থকদের পরিকল্পিত নির্যাতনে শুরু হয় বিপুল সংখ্যায় দেশত্যাগ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মানুষের সৃষ্টি করা এ ধরনের তাণ্ডবের নজির আর কোথাও নেই; ফিলিস্তিনেও না, ভিয়েতনামেও না। প্রাণের ভয়ে এমন বিপুলসংখ্যক মানুষের স্বদেশত্যাগের ঘটনাও আধুনিক ইতিহাসে আর নেই। শরণার্থীর এমন অবিরাম স্রোত কেউ দেখেনি। মানুষের এমন দুঃখ, কষ্ট, দুর্দশার বর্ণনা অসম্ভব।

আমাদের সেই দুঃসময়ে ভারতসহ অনেক রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। এমনই একটি প্রতিষ্ঠান অক্সফাম বিশেষভাবে যুক্ত ছিল শরণার্থী ব্যবস্থাপনায়। যুক্তরাজ্যভিত্তিক অক্সফামের তখনকার সদর দপ্তর অক্সফোর্ডের ২৭৪ বানবারি রোডে। অক্সফামের জনসেবা কার্যক্রম শুরু হয় ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। অক্সফামের সঙ্গে তখন জড়িত রিচার্ড এক্সলে ও হেলেন এক্সলে। আর সেই সময় এই বিপদাপন্ন বাংলাদেশি শরণার্থীদের ব্যবস্থাপনা সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন জুলিয়ান ফ্রান্সিস। তাঁর বিভিন্ন লেখায় বলেছে শরণার্থী-সমস্যা ও পূর্ব পাকিস্তানের সংকট নিয়ে গোটা পৃথিবীর নিস্পৃহতা কাটাতে উদ্যোগী হয়েছিল অক্সফাম। একটি আঘাত দিয়ে পৃথিবীর বিবেককে জাগাতেই অক্সফাম বিশেষ একটি দলিল প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়। সেই দলিলটির নামই দেওয়া হয় টেস্টিমনি অব সিক্সটি–ষাটজনের সাক্ষ্য। কোন ৬০ জন? যাঁরা সংকটের ভয়াবহতা দেখেছেন, যাঁরা এই ভয়াবহ বর্ণনাতীত পরিস্থিতিতে বসবাস করছেন, তাঁদের সাক্ষ্য। এই স্বর তাঁদেরই স্বর। সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে আছেন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি ও মাদার তেরেসা। বরেণ্য সাংবাদিকদের মধ্যে আছেন জন পিলজার, মাইকেল ব্র্যানসন, ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থ, নিকোলাস টোমালিন, মার্টিন উলাকট, এলেক্স হেনড্রি, অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস, ডেভিড লোসাক, অ্যালান হার্ট, রুদ মস প্রমুখ।

সাংসদদের মধ্যে রয়েছেন জন স্টোনহাউস, বার্নার্ড ব্রেইন, জেমস রামসডেন, ক্রস ডগলাস-মান প্রমুখ। এসব লোকের কাছে দৌড়ে দৌড়ে যাওয়া হলো। সংগ্রহ করা হলো তাঁদের সাক্ষ্য ও বিশ্ববাসীর প্রতি তাঁদের আবেদন। সবাই লেখার হাত বাড়িয়ে দিলেন। বরেণ্য চিত্রগ্রাহকেরা তাদের দুর্লভ ছবি পাঠালেন। শিল্পী জেরার্ড স্কার্ফ লেখা না পাঠিয়ে পাঠালেন কয়েকটি স্কেচ। সব মিলিয়ে দাঁড়িয়ে গেল অসাধারণ এক প্রকাশনা। সে সময় অক্সফামের পরিচালক ছিলেন লেসলি কার্কলে। এই দুর্লভ ও মানবিক প্রকাশনাটির মুখবন্ধ লিখেছেন তিনি। বার্কলে লিখছেন, এই গল্প তাড়া-খাওয়া, গৃহহারা, মৃত্যু-উন্মুখ মানুষের। যখন এ-প্রান্তে মহাপ্রলয়, বিশ্ব সম্প্রদায় উটপাখির মতো মাথা গুঁজে রাখার খেলায় ব্যস্ত। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হলো ইতিহাসের অসামান্য এক দলিল। তত দিনে অক্সফাম পরিচালকের ভাষায় সুইডেন ও নিউজিল্যান্ডের মোট জনসংখ্যার সমসংখ্যক মানুষ স্বদেশ ছেড়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়েছে। এই দলিল প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল আসন্ন জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশন চলাকালে বিতরণ করা। উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

এই প্রকাশনা বিশ্ববিবেককে নাড়া দিয়েছে। নাড়া দেওয়ার আরেকটি কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলেন সিনেটর কেনেডি। তিনি সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের শরণার্থীবিষয়ক সিনেট উপকমিটির চেয়ারম্যান। একাত্তরের ভারতের সীমান্তবর্তী শরণার্থীশিবির পরিদর্শন করেন, শত শরণার্থীর সঙ্গে কথা বলেন কেনেডি। এই সাক্ষ্য দলিলে তিনি ‘দুর্দশার মোজাইক’ নামে একটি লেখা লেখেন। সেখানে জোর দিয়ে বলেন, এই ট্র্যাজেডির ব্যাপকতা পৃথিবী বুঝে উঠতে পারেনি। তিনি বলেন, ‘পূর্ব বাংলার ট্র্যাজেডি কেবল পাকিস্তানের জন্য ট্র্যাজেডি নয়, এটা কেবল ভারতের জন্য ট্র্যাজেডি নয়, এটা সমগ্র বিশ্বসম্প্রদায়ের জন্য ট্র্যাজেডি।’

এটুকু বলে কাজ শেষ মনে করেননি কেনেডি। তাঁরই প্রস্তাব অনুযায়ী এই দলিলটি বাংলার সংকটের সাক্ষ্য হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ৯২তম কংগ্রেসের কার্যক্রমে রেকর্ডভুক্ত হয়। এমনি করেই একাত্তরে আমাদের এই বাংলাদেশের সংকটের সঙ্গে বিশ্বকে পরিচিত করে

শরণার্থী শিবিরে।

ভারত সরকার প্রথম যখন দেখল, শরণার্থীর মর্মন্তুদ স্রোতোধারা সীমান্ত পেরিয়ে কেবল আসছেই, সীমান্ত ঘিরে ফেলে তাদের প্রবেশধিকার রুদ্ধ করতে পারত। কিন্তু ভারত বেছে নিল সহমর্মিতার পথ, যা ভারতের চিরস্মরণীয় গৌরবের সঙ্গে যুক্ত হলো। এই বিপুলসংখ্যক শরণার্থীকে সহযোগিতা করা ও আশ্রয় দেওয়া একটি দানবীয় উদ্যোগ। এ উদ্যোগের রেকর্ড ইতিহাস লিখবে এবং স্মরণ রাখবে। সমস্যার যে আকৃতি, তা কল্পনাকেও থমকে দেয় এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা পালিয়ে এসেছে, তাদের কাহিনি হৃদয়কে বিদীর্ণ করে।

দিয়েছেন অসামান্য কিছু মানুষ। নিশ্চয়ই এসব উদ্যোগ কোনো না কোনোভাবে সহায়তার হাত বাড়িয়েছে আমাদের সংগ্রামে।

কেনেডির দুর্দশার মোজাইক

শরণার্থীদের গুরুভার বহন করতে বিশ্বসম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার জন্য সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির আবেদন।

এই কঠিন ট্র্যাজেডি এখনো পৃথিবী বুঝে উঠতে পারেনি। আমি আপনাদের বলতে পারি, যতক্ষণ না নিজ চোখে দেখছেন, এর বিশাল ব্যাপ্তি সম্পর্কে ধারণাও করতে পারবেন না। কেবল সেখানে গেলেই সেখানকার অনুভূতিটা আপনি আঁচ করতে পারবেন, মানুষের ভোগান্তি বুঝতে পারবেন, সহিংসতার যে শক্তি শরণার্থীর জন্ম দিচ্ছে এবং বেসামরিক মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়ে যাচ্ছে, তা অনুধাবন করতে পারবেন। ভারতে থাকাকালে পূর্ব বাংলার সীমান্তজুড়ে ছড়ানো শরণার্থী এলাকাগুলো আমি ঘুরে দেখেছি; কলকাতা ও পশ্চিম বাংলার পশ্চিমে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত, উত্তরে দার্জিলিং জেলা এবং পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা ঘুরে এসেছি।

ক্যাম্পে ভিড় করা রাশি রাশি শরণার্থীর কথা আমি শুনেছি। খোলা মাঠে কিংবা সরকারি ভবনের পেছনে, দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ মরিয়া হয়ে পা টেনে টেনে হেঁটে আসা মানুষ, কলকাতার রাস্তার অস্থায়ী আশ্রয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাদের চেহারা এবং তাদের কাহিনি লজ্জার দীর্ঘ চিত্র রচনা করে, যা পৃথিবীর সকল মানুষের নৈতিক সংবেদনশীলতাকে হতবাক করে রাখে। আমি দেখেছি, এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পের অবস্থার মধ্যে ব্যাপক তারতম্য রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশেরই বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। সরবরাহের অপর্যাপ্ততায় পয়োনিষ্কাশনের ভীতিকর অবস্থায় সেই শরণার্থীদের যারা কাশিতে ভুগছে, তারা শিশু–যাদের বয়স পাঁচ বছরের কম এবং বয়োবৃদ্ধ। তারাই সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী। এদের আনুমানিক সংখ্যা মোট শরণার্থীর প্রায় ৫০ শতাংশ। এই শিশু ও বৃদ্ধের অনেকেই এর মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। শরণার্থীদের মাঝখান দিয়ে হেঁটে গেলে, দেখে দেখে শনাক্ত করা সম্ভব, এক ঘণ্টার মধ্যে কারা মারা যাবে আর কাদের ভোগান্তি চিরতরে শেষ হওয়াটা কেবল কয়েক দিনের ব্যাপার মাত্র।

শিশুদের দিকে দেখুন, তাদের ছোট্ট হাড় থেকে আলগা হয়ে ভাঁজে ভাঁজে ঝুলে পড়া ত্বক, এমনকি তাদের মাথা তোলার শক্তিও নেই। শিশুদের পায়ের দিকে দেখুন, পা ও পায়ের পাতায় পানি নেমে ও অপুষ্টিতে ফুলে আছে। তাদের মায়ের হাতও নিস্তেজ। তাকিয়ে দেখুন, ভিটামিনের অভাবে শিশুরা অন্ধ হয়ে যাচ্ছে কিংবা তাদের এমন ঘা, যা কখনো সেরে যাওয়ার নয়। শিশুদের মা-বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখুন, তাদের সন্তান আর কখনো সুস্থ হয়ে উঠবে না, সেই হতাশা তাদের চোখে। আর সবচেয়ে বেশি কঠিন দৃশ্যটি দেখুন, গত রাতে যে শিশুটি মারা গেছে, তার মৃতদেহও এখানেই।

ক্যাম্পের পর ক্যাম্পে গল্প একই। এমনিতেই ঠাঁই হয় না, এমন হাসপাতালে অবিরাম বাড়তে থাকা বেসামরিক মৃত্যু পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এসব ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মানুষকে তাদেরই সহশরণার্থীরা সীমান্তের ওপার থেকে বয়ে এনেছে। তারপরও সীমান্তবর্তী বহুসংখ্যক ভারতীয় বাড়িঘর পাকিস্তানি সেনাদের গোলার শিকার হয়েছে। এ ছাড়া অকথি তসংখ্যক আহত মানুষ, যাদের গোনা হয়নি, যাদের দেখাশোনার কেউ নেই, পূর্ব বাংলার গ্রামীণ এলাকায় পড়ে আছে।

ভারত সরকার প্রথম যখন দেখল, শরণার্থীর মর্মন্তুদ স্রোতোধারা সীমান্ত পেরিয়ে কেবল আসছেই, সীমান্ত ঘিরে ফেলে তাদের প্রবেশধিকার রুদ্ধ করতে পারত। কিন্তু ভারত বেছে নিল সহমর্মিতার পথ, যা ভারতের চিরস্মরণীয় গৌরবের সঙ্গে যুক্ত হলো। এই বিপুলসংখ্যক শরণার্থীকে সহযোগিতা করা ও আশ্রয় দেওয়া একটি দানবীয় উদ্যোগ। এ উদ্যোগের রেকর্ড ইতিহাস লিখবে এবং স্মরণ রাখবে। সমস্যার যে আকৃতি, তা কল্পনাকেও থমকে দেয় এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা পালিয়ে এসেছে,

তাদের কাহিনি হৃদয়কে বিদীর্ণ করে।

৫৫ বছর বয়স্ক একজন রেলওয়েশ্রমিক–৩৫ বছরের অভিজ্ঞতালব্ধ একজন মুসলমান সরকারি চাকুরে–আমার কাছে পাকিস্তানি সেনাদের মধ্যদুপুরে রেল রোড স্টেশন আক্রমণের কাহিনি শোনালেন, যে আক্রমণের কোনো ব্যাখ্যা নেই। বললেন, 'ওরা আমাকে কেন গুলি করল জানি না। আমি তো কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নেই, আমি রেলওয়ের কেবল একজন কেরাণি।' এখন তিনি ভারতীয় একটি শরণার্থীশিবিরে অলসভাবে বসে থাকেন, অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু এবং তার দীর্ঘদিনের উপার্জিত পেনশন, যা আগামী মাস থেকে পাওয়ার কথা, ফিরে গিয়ে তা গ্রহণ করার সম্ভাবনা আর নেই।

আরও ট্র্যাজিক অভিজ্ঞতা হচ্ছে নিষ্পাপ ও অশিক্ষিত গ্রামবাসীর। কলকাতার উত্তরে বয়রা-বনগাঁও সড়কের ডজনখানেক নতুন শরণার্থীর সাক্ষাৎকার নিয়ে টুকরো টুকরো কাহিনিগুলো একত্র করে দুর্দশার মোজাইক তৈরি করা সম্ভব।

যেদিন আমরা এই ২০ মাইল সড়ক ঘুরি, সেদিন কমপক্ষে সাত হাজার শরণার্থী বয়রার কাছে নদী পেরিয়ে সীমান্তের পাড় ঘেঁষে স্রোতোধারার মতো নেমে এসেছে। এদের প্রায় সবাই কৃষক, চাষি-মজুর। অধিকাংশই হিন্দু। ঢাকা জেলার দক্ষিণে খুলনা ও বরিশাল থেকে এসেছে। এসেছে গত শরতের সাইক্লোনে বিধ্বস্ত প্রান্তবর্তী জেলা থেকে।

সাধারণত পায়ে হেঁটে বহু দিন বহু রাতের এই দীর্ঘ পথচলায় শিশু ও বৃদ্ধরা ক্লান্ত। মানসিক আঘাতের সাক্ষ্য দিচ্ছে অনেকের চেহারা, রাস্তার পাশে লক্ষ্যহীনভাবে বসে আছে অথবা অজানা নিয়তির উদ্দেশে লক্ষ্যহীনভাবে হাঁটছে। তারা নৃশংসতার গল্প বলেছে, মানুষ জবাই করার গল্প বলেছে, লুট ও অগ্নিকাণ্ডের কথা বলেছে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসরদের হাতে হয়রানি ও লাঞ্ছিত হওয়ার গল্প বলছে। বহু শিশু রাস্তায় মারা যাচ্ছে। তাদের মা-বাবা তাদের বাঁচাতে অনুনয় জানাচ্ছে, ভিক্ষা চাচ্ছে। বর্ষাকালের বৃষ্টি গ্রামের দিকের সবকিছু ভিজিয়ে দিয়েছে। তাদের চেহারায় যোগ হয়েছে আরও বিষণ্নতা ও হতাশা। সেদিন আমরা যারা বাইরে বের হয়েছিলাম, আমাদের জন্য বৃষ্টি মানে বড়জোর কাপড় বদলের চেয়ে বেশি কিছু নয়; কিন্তু এই মানুষগুলোর জন্য বৃষ্টির মানে আরও একটি রাত বিশ্রাম, খাদ্য ও আশ্রয়বিহীন কাটিয়ে দেওয়া। যে শিশুটির কোমর থেকে নিচ পর্যন্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত, আর কখনো হাঁটতে পারবে না, কিংবা যে শিশুটি তার চোখের সামনে মা, বাবা, ভাই ও বোনদের হত্যা করতে দেখেছে, ছোট তাঁবুতে মাদুরে বসে ভয়ে কাঁপছে; আমরা পৌঁছানোর কয়েক মুহূর্ত আগে তার সেই ভাইটির মৃত্যু হয়েছে, এই শিশুদের চেহারা মন থেকে মুছে ফেলা খুব কঠিন কাজ। আমি যখন একজন শরণার্থীশিবিরের পরিচালককে জিজ্ঞেস করলাম, তার সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজনটি কী? জবাব এল, 'একটি শব-চুল্লি।' পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ একটি ক্যাম্পের তিনি পরিচালক। নিম্ন ও মধ্য আয়ের মানুষের আবাসনের জন্য এ জায়গা ঠিক করা হচ্ছিল, এটি এখন ১ লাখ ৭০ হাজার শরণার্থীর বাড়ি।

পূর্ব বাংলার ট্র্যাজেডি শুধু পাকিস্তানের জন্য ট্র্যাজেডি নয়, এটা শুধু ভারতের জন্য ট্র্যাজেডি নয়, এটা সমগ্র বিশ্বসম্প্রদায়ের জন্য ট্র্যাজেডি এবং একই সংকট নিরসনের জন্য একত্রে কাজ করা এই সম্প্রদায়েরই দায়িত্ব।

সাধারণ মানবতার দাবি, যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘ সত্যকে কবুল করে নিক যে এই বিশাল বোঝা বহন করতে হবে সমগ্র আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে, শুধু ভারতকে নয়।

কেনেডি ১৯৬২ থেকে সিনেটর। ১৯৭১-এ তার বয়স ৩৯, তখন তিনি শরণার্থীবিষয়ক সিনেট জুডিশিয়ারি উপকমিটির চেয়ারম্যান। ১৯৭১-এর আগস্টে তিনি এলেন বাংলার মানুষের দুর্দশার সাক্ষী হতে, নিজ চোখে দেখে বিশ্ববিবেক জাগাতে।

তিনি কলকাতা, জলপাইগুড়ি, ত্রিপুরা ও দার্জিলিংয়ের শরণার্থীশিবির পরিদর্শন করলেন এবং লিখলেন: পূর্ব বাংলার ট্র্যাজেডি শুধু পাকিস্তানের জন্য ট্র্যাজেডি নয়, এটা শুধু ভারতের জন্য *এরপর পৃষ্ঠা ১৪*

যেদিন আমরা এই ২০ মাইল সড়ক ঘুরি, সেদিন কমপক্ষে সাত হাজার শরণার্থী বয়রার কাছে নদী পেরিয়ে সীমান্তের পাড় ঘেঁষে স্রোতোধারার মতো নেমে এসেছে। এদের প্রায় সবাই কৃষক, চাষি-মজুর। অধিকাংশই হিন্দু। ঢাকা জেলার দক্ষিণে খুলনা ও বরিশাল থেকে এসেছে। এসেছে গত শরতের সাইক্লোনে বিধ্বস্ত প্রান্তবর্তী জেলা থেকে।

▲ শরণার্থীরা প্রাণ বাঁচাতে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে এসেছে, দক্ষিণের খুলনা, বরিশাল থেকে...

একাত্তরের বিবিসি লন্ডন

আন্দালিব রাশদী

একাত্তরের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য গণমাধ্যম ছিল বিবিসি–ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন। এ দেশের মানুষের সাথে বিবিসি বাংলা বিভাগের একটি আবেগময় সম্পৃক্ততা থাকার কথাই। কিন্তু ওয়ার্ল্ড সার্ভিস? বিবিসিতে কী শুনেছে বিশ্ববাসী? কয়েকটি নির্বাচিত সংবাদের অনুবাদ উপস্থাপন করা হচ্ছে এখানে এবং একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায় প্রথম দিককার সংবাদ প্রচারে ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব; কিন্তু একটি নতুন স্বাধীন দেশের যে আবির্ভাব ঘটছে, সেই বার্তাটি জানাতে বেশি দিন লাগেনি বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের। তাই ১৯৭১ সালে কেমন ছিল বাংলাদেশ, কোন দিকে যাচ্ছিল, মুক্তিযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি, সকল কিছুর জীবন্ত ইতিহাস উঠে এসেছে বিবিসির এসব সংবাদভাষ্যে। এই রচনার প্রথম সংবাদটি প্রচারিত হয় ২৬ মার্চ ১৯৭১ এবং শেষ সংবাদটি ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১।

২৬ মার্চ ১৯৭১ বিবিসি লন্ডন

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে তার সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করায় সেখানে ব্যাপক লড়াই শুরু হয়েছে বলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে খবর পাওয়া গেছে। অন্যদিকে ভারত থেকে পাওয়া খবরে জানা গেছে, শেখ মুজিবুর রহমান প্রদেশটির স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। পূর্বাঞ্চলের রাজধানী ঢাকায় অবস্থানরত মার্কিন কনসাল জেনারেল জানিয়েছেন, বিরোধীদের দমন করতে সেখানে কামানও ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারত থেকে পাওয়া আগের আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সর্বত্র তীব্র লড়াই চলার খবর পূর্ব পাকিস্তানের একটি গোপন বেতারকেন্দ্র থেকে সম্প্রচার করা হয়েছে। পূর্ব বাংলার সেনা ইউনিটগুলো, এর মধ্যেই পুলিশ সশস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা ইউনিটগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে সরাসরি কোনো সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কঠোর ভাষায় শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের দল আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি তার নিজস্ব কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। কার্যত আওয়ামী লীগই পূর্ব পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়েছিল। প্রেসিডেন্ট সব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং প্রেসের ওপর পুরো সেন্সরশিপ আরোপ করেছেন।

২৭ মার্চ ১৯৭১ (প্রথম সংবাদ)

সর্বশেষ পাওয়া খবরে জানা গেছে, সেনাবাহিনী ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, গোলযোগ দমনের জন্য ট্যাংক ব্যবহার করা হয়েছে। সরকারি বেতার মাধ্যম রেডিও পাকিস্তান জানিয়েছে, শহরে বলবৎ সান্ধ্য আইন আজ (শনিবার) ৯ ঘণ্টার জন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। রোববারও একইভাবে একই সময়ের জন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। রেডিও থেকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, যারা রাস্তাঘাট অবরোধ করবে এবং ব্যারিকেড বসাবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সেনাবাহিনী শহরের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের একটি গোপন বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত সংবাদের কয়েকটি দাবি, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের অনুসারীরা চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর নিয়ন্ত্রণ করছে এবং সামরিক আইন প্রশাসক (জেনারেল টিক্কা খান) জখম হয়েছেন। রেডিও পাকিস্তান তা নাকচ করে দিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে কঠোর সেন্সরশিপ আরোপ করার কারণে সেখানে কী ঘটছে, তার কোনো নিরপেক্ষ চিত্র পাওয়া যাচ্ছে না।

২৭ মার্চ ১৯৭১ (দ্বিতীয় সংবাদ)

তিন দিন আগে সেনা মোতায়েনের একজন চাক্ষুষ সাক্ষী বিবিসি প্রতিনিধি নিজেই: তাকে ঢাকা থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া

পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি নিয়ে পাকিস্তান রেডিও অবিরাম বলে যাচ্ছে, প্রধান শহরগুলো এখন শান্ত, তবে কোনো কোনো এলাকায় গোলযোগ হবার খবর যথার্থ বলে স্বীকার করে নিয়েছে। এসব ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, দুষ্কৃতকারীরা শান্তিপূর্ণ নাগরিকদের আতঙ্কিত করতে তা করে যাচ্ছে।

হয়েছিল। তিনি বলেছেন, ঢাকা শহরের লোকদের সন্ত্রস্ত করার জন্য সেনাবাহিনী পূর্বপরিকল্পিত নিষ্ঠুর একটি অপারেশন চালিয়েছে। আমাদের সংবাদদাতা আরও বলেছেন, ট্যাংক ও আর্মার্ড ট্রাকভর্তি সৈন্য খুব কমই প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে, যদিও ছাত্রদের হাতে কিছু অস্ত্র ছিল। চারদিকে গুলির শব্দ এবং ভবনগুলোতে লেলিহান অগ্নিশিখা। আমাদের প্রতিনিধি ও তার সঙ্গী ফিল্ম ক্রুকে তিনবার ব্যাপকভাবে তল্লাশি করা হয়েছে। দেশের বাইরে প্রেরণের আগেই তাদের সংবাদ ও কাগজপত্র জব্দ করে রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, সামরিক সরকার মরিয়া হয়ে উঠেছে, যাতে সেন্সরবিহীন সংবাদ দেশের বাইরে যেতে না পারে। প্রতিনিধি আরও জানিয়েছেন, সামরিক বাহিনীর বিবৃতিতে নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদটি সম্ভবত সত্য।

১ এপ্রিল ১৯৭১

সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানকারী সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের পাঠানো প্রতিবেদন থেকে দেখা যাচ্ছে, রাজধানী ঢাকাসহ অন্য প্রধান শহরে দৃঢ় সামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিনিধিরা আরও জানিয়েছেন, সেনাবাহিনী নামার পরপরই ঢাকার অংশবিশেষে বেসামরিক নাগরিক, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের অনুসারীদের ব্যাপক হারে হত্যা করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও সেখানকার কর্মচারীদের নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবি সৈন্যদের দায়ী করা হয়েছে। শহরের একটি বড় অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে, এখনো সেখানে আগুন জ্বলছে। কোনো কোনো প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, শহরের বাইরে গোলযোগ অব্যাহত রয়েছে। মার্কিন সংবাদ সংস্থা ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনালের সংবাদদাতা জানিয়েছেন, ভারতীয় সীমান্তের অনতিদূরে পূর্ব পাকিস্তানের একটি শহরে (যশোর) তিনি পৌঁছেছেন। তিনি বলেছেন, সেখানে তাকে মহিলা ও শিশুদের মৃতদেহ দেখানো হয়েছে। তিনি জানতে পেরেছেন, শহর ছেড়ে যাওয়ার আগে পাকিস্তানি সেনারা বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে তাদের হত্যা করেছে। পাকিস্তান অভিযোগ করেছে, ভারতীয় সেনাবাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকে পড়েছে; কিন্তু ভারত সরকারের মুখপাত্র তা অস্বীকার করেছে।

২ এপ্রিল ১৯৭১ বিবিসি লন্ডন

পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি নিয়ে পাকিস্তান রেডিও অবিরাম বলে যাচ্ছে, প্রধান শহরগুলো এখন শান্ত, তবে কোনো কোনো এলাকায় গোলযোগ হবার খবর যথার্থ বলে স্বীকার করে নিয়েছে। এসব ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, দুষ্কৃতকারীরা শান্তিপূর্ণ নাগরিকদের আতঙ্কিত করতে তা করে যাচ্ছে। (ভারত সীমান্ত থেকে) পূর্ব পাকিস্তানের ৪০ কিলোমিটার ভেতরে যশোর থেকে সদ্য ফিরে আসা বিবিসির বিশেষ সংবাদদাতা জানিয়েছেন, তিনি যখন ফিরছিলেন, তখনো লড়াই চলছিল। তিনি বলেন, সরকারি সৈন্যরা নারী ও শিশুদের হত্যা করেছে এবং বহুসংখ্যক বাড়িঘর পুড়িয়ে ফেলেছে। তবে এই সাংবাদিক ফিরতে ফিরতে তারা আবার পূর্বাঞ্চলের দখল নিয়ে নিয়েছে এবং মাইলখানেক দূর থেকে সরকারি সৈন্যরা এই এলাকায় কামান ও মর্টারের গোলাবর্ষণ শুরু করেছে।

বিবিসির পাকিস্তানবিষয়ক প্রথম খবরটিতে এই সংবাদদাতা জানিয়েছেন, ইয়াহিয়া খানের নির্মম প্রচেষ্টা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছেশক্তি ও মনোবল ধ্বংস করতে ব্যর্থ হয়েছে।

একই দিনের অপর একটি বিবিসি সংবাদ

রেডক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটি জানিয়েছে, পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানে রেডক্রস প্রতিনিধি ও ত্রাণসামগ্রীর প্রবেশাধিকার প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

জেনেভাতে প্রকাশিত রেডক্রসের একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রেডক্রসের দুজন ডাক্তারসহ তাদের প্রতিনিধিকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে; আট টন মেডিকেল ও ত্রাণসামগ্রীসহ রেডক্রসের উড়োজাহাজ ফিরে আসছে। জেনেভা থেকে বিবিসিতে পাঠানো প্রতিবেদনে সংবাদদাতা জানিয়েছে, রেডক্রস প্রতিনিধিদের পাকিস্তানি কর্মকর্তা স্পষ্টত জানিয়ে থাকবেন যে বাইরের কোনো হস্তক্ষেপ সহ্য করা হবে না, এমনকি আন্তর্জাতিক কোনো মানবিক সাহায্য সংস্থার হস্তক্ষেপও না।

একই দিনের চতুর্থ বিবিসি সংবাদ

পূর্ব পাকিস্তান থেকে একটার পর একটা সহিংসতা ও হত্যাকাণ্ডের খবর আসছে। লন্ডন টাইমসের বিদেশ সংবাদদাতার চাক্ষুষ বিবরণ থেকে যশোরের অবস্থা জানা যায়। তিনি বলেন, পাকিস্তান সরকারের বাহিনী মিলিটারি ক্যাম্প এলাকা থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করেছে। ফলে শহরটি এখন পূর্ব পাকিস্তানি বাহিনী এবং শেখ মুজিবুর রহমানের সমর্থক ও অনুসারীদের দখলে। তিনি বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের অনিয়মিত আধা সামরিক বাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানে জন্য এমন সব মানুষকে ঘিরে, হাঁটিয়ে বাজারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করার অভিযোগ আনা হয়েছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যেভাবে গুলি করে বাঙালিদের হত্যা করেছে, তারই প্রতিশোধ হিসেবে একই নির্মমতায় তাদের হত্যা করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

পশ্চিম পাকিস্তান রেডিও একটানা বলে যাচ্ছে, পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের সবগুলো প্রধান শহর এখন শান্ত। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী উড়োজাহাজ, ট্যাংক ও রকেটের সাহায্যে ভয়াবহ প্রত্যাঘাত করছে বলে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের কাছে নালিশ জানিয়েছে।

১৭ নভেম্বর ১৯৭১

পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় এখন অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ চলছে। খুব ভোরের বেতার ঘোষণায় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত জনগণকে বাড়ির ভেতর থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘর ঘরে তল্লাশি চলছে। লাইসেন্সবিহীন অস্ত্র,

বিবিসির বিশেষ সংবাদদাতা ঢাকা থেকে জানিয়েছেন, গেরিলা আক্রমণের তীব্রতা ও পরিধি বাড়ছে। তিনি আরও বলেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বিশ্বাস করে, কেবল ঢাকা শহরেই কমপক্ষে দুই হাজার গেরিলা সক্রিয় রয়েছে। তিনি বলেন সর্বশেষ ঘটনায় ঢাকায় ছোট অস্ত্রের গুলির শব্দ শোনা গেছে এবং বিভিন্ন স্থানে আগুন জ্বলতে দেখা গেছে। বুলেটে জখম বহুসংখ্যক লোককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গোলাবারুদ বাড়ির বাইরে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্স, বিদ্যুৎ বোর্ড ও পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনসের গাড়ি ছাড়া সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শহরের ছয়টি পুলিশ থানার নিয়ন্ত্রণ ব্রিগেডিয়ারদের হাতে রয়েছে।

ঢাকা শহর ও শহরের আশপাশে গতকাল গেরিলা অভিযানের ঘটনা ঘটেছে। বোমা বিস্ফোরণ ও গোলাগুলিতে কেউ কেউ নিহত এবং অনেকেই আহত হয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়েছে। বিভিন্ন স্কুলে আক্রমণ চালিয়ে ক্ষতিসাধন করা হয়েছে।

২৩ নভেম্বর ১৯৭১

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। রেডিও পাকিস্তান জানিয়েছে, বহিঃশত্রুর আক্রমণের হুমকির কারণে যে সংকটকালীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তার মোকাবিলায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন। একই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের সব অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানিরা বলছে, যশোর বিমানঘাঁটি ভারতীয় গোলন্দাজ আক্রমণের শিকার হয়েছে। পাকিস্তান মনে করে, কামান ইউনিটের সহায়তায় সীমান্তের অপর পার থেকে ভারতীয় সৈনিকেরা এই বিমানঘাঁটি লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করছে। ভারত অবশ্য সেনা আক্রমণের অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং জানাচ্ছে, পাকিস্তান বাঙালি গেরিলাদেরই ভারতীয় সৈন্য বলতে শুরু করেছে। আকাশবাণী থেকে বলা হয়েছে, গেরিলা যোদ্ধারা সিলেট জেলার বেশ ভেতরে ঢুকে পড়েছে, যশোর ও রংপুর এলাকায় তীব্র লড়াই চলছে। রেডিও পাকিস্তান থেকে জানানো হয়েছে, যশোর, সিলেট ও চট্টগ্রাম এলাকায় যুদ্ধ চলছে। তবে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা হয়েছে এবং তাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে।

২ ডিসেম্বর ১৯৭১

বিবিসির বিশেষ সংবাদদাতা ঢাকা থেকে জানিয়েছেন, গেরিলা আক্রমণের তীব্রতা

ও পরিধি বাড়ছে। তিনি আরও বলেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বিশ্বাস করে, কেবল ঢাকা শহরেই কমপক্ষে দুই হাজার গেরিলা সক্রিয় রয়েছে। তিনি বলেন সর্বশেষ ঘটনায় ঢাকায় ছোট অস্ত্রের গুলির শব্দ শোনা গেছে এবং বিভিন্ন স্থানে আগুন জ্বলতে দেখা গেছে। বুলেটে জখম বহুসংখ্যক লোককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে তিনজন সেনাসদস্য রয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি পেট্রলপাম্প উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

৩ ডিসেম্বর ১৯৭১

ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশ থেকেই জানানো হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক গভর্নর চিকিৎসক আবদুল মালিক বেতার ঘোষণায় সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, পাকিস্তান ধ্বংসাত্মক এক যুদ্ধের মুখোমুখি। বিবিসিকে পাঠানো এক বার্তায় একজন সংবাদদাতা জানিয়েছেন, পূর্বাঞ্চলীয় সেক্টরের শমশেরনগর, দিনাজপুর, যশোর, রংপুর, খুলনা, ময়মনসিংহসহ সীমান্তের সর্বত্র তীব্র লড়াই অব্যাহত রয়েছে। আমাদের প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, পাকিস্তান দাবি করেছে, তারা ভারতীয় আক্রমণ প্রতিহত করেছে এবং ভারতীয়দের জীবন ও সম্পদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আকাশবাণীর খবরে বলা হয়েছে, গত বুধবার থেকে পাকিস্তানি বাহিনী ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় বোমা ফেলতে শুরু করলে ভারতীয় বাহিনী, তাদের ভাষায়, প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করেছে। খবরের বলা হয়েছে, গেরিলারা ঠাকুরগাঁও শহর ও বিমানঘাঁটি এবং সিলেটের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত শমশেরনগর বিমানঘাঁটি অধিকার করে নিয়েছে। কিন্তু রাওয়ালপিন্ডির একজন সামরিক মুখপাত্র জানিয়েছেন, ঠাকুরগাঁওয়ে ভারতীয় বাহিনী কৌশলগতভাবে কিছু অর্জন করলেও কার্যত বিমানঘাঁটি এখনো পাকিস্তানি বাহিনীর দখলেই রয়েছে।

১২ ডিসেম্বর ১৯৭১

ভারত জানিয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকার আশপাশে ভারতীয় প্যারাট্রুপার নামানো হয়েছে, পদাতিক বাহিনী চারদিক থেকে শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার মেজর জেনারেল জ্যাকব জানিয়েছেন, গতকাল পরিচালিত বিমান আক্রমণ সফল হয়েছে। এর বেশি কিছু তিনি বলতে সম্মত হননি। তবে ভারতীয় কমান্ডার বলেছেন, তাঁর বাহিনী মেঘনা নদী অতিক্রম করেছে এবং এখন শহরের ২০ মাইল (৩২ কিলোমিটার) এলাকার মধ্যে পৌঁছে গেছে। তবে তাদের প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হয়েছে। ভারতীয় বাহিনী জানাচ্ছে, কুমিল্লার সব নদী ও শাখানদী এখন তাদের নিয়ন্ত্রণে এবং মুক্তিবাহিনীর গেরিলা ইউনিট ঢাকায় খুবই সক্রিয়। শহরের ভেতর লড়াই চলছে।

১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১

পূর্ব পাকিস্তানের অবরুদ্ধ রাজধানী ঢাকার দিকে ভারতীয় সৈন্যরা দ্রুত এগিয়ে আসছে। পাকিস্তান বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান (জেনারেল নিয়াজি) বলেছেন, শেষ লোকটি জীবিত থাকা পর্যন্ত তার সেনাবাহিনী লড়াই করে যাবে। আত্মসমর্পণের জন্য ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল স্যাম মানেকশের আরও একটি আহ্বান তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভারতীয়রা বলছে, তাদের দুটি কামানবহর প্যারাট্রুপারদের সমর্থন নিয়ে উত্তর-পশ্চিমে টাঙ্গাইল থেকে ঢাকা এবং উত্তর-পূর্বে নরসিংদী থেকে ঢাকার দিকে এগিয়ে আসছে। কয়েকটি অগ্রগামী ইউনিট জয়দেবপুরে ঢাকার সেনাঘাঁটি থেকে মাত্র ১০ মাইল (১৬ কিলোমিটার) দূরত্বের মধ্যে অবস্থান করছে। ঢাকায় অবস্থানরত বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সাংবাদিকেরা জানাচ্ছেন, ভারতীয় সৈন্যরা ঢাকা থেকে মাত্র ৯ মাইল দক্ষিণে ডেমরাঘাট পর্যন্ত পৌঁছেছে। ভারত বলছে, খুলনার কাছে দৌলতপুর ঘাঁটিতে এখনো লড়াই চলছে এবং দক্ষিণাঞ্চলের বন্দর চালনাতে ভারতীয় বাহিনীকে কঠোর প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১

ভারতীয়রা বলছে, তারা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় ভারী অস্ত্রের গোলাবর্ষণ করে যাচ্ছে এবং ভারতীয় বাহিনী ও বাংলাদেশের গেরিলারা বহিঃপ্রতিরক্ষায় আক্রমণ করে তাদের মনোবল ভেঙে দিচ্ছে। সংবাদদাতাদের পাঠানো একটি সম্মিলিত বার্তায় জানা যাচ্ছে, রেডক্রস ও পাকিস্তানি কমান্ডার-ইন-চিফ জেনারেল নিয়াজির মধ্যে অস্ত্রবিরতি নিয়ে দর-কষাকষি চলছে, তবে এখনো তা থেকে সুনির্দিষ্ট কিছু উঠে আসেনি। বার্তায় বলা হয়েছে, ঢাকা ও ঢাকার আশপাশে বিমান আক্রমণ তীব্রতর করা হয়েছে, বিশেষ করে জেনারেল নিয়াজির সদর দপ্তর ও সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলো এই আক্রমণের প্রধান টার্গেট।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে। রেডিও পাকিস্তান জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতি হয়েছে এবং ভারতীয় বাহিনী রাজধানী ঢাকায় প্রবেশ করেছে। পাকিস্তান বলেছে, স্থানীয় ভারতীয় ও পাকিস্তানি কমান্ডারদের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি করা হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধী সংসদে বলেছেন, দুপক্ষের প্রতিনিধি ঢাকায় আত্মসমর্পণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। পাকিস্তানের পক্ষে এই চুক্তি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। তিনি বলেন, ভারত আশা করে, পূর্ব পাকিস্তানিদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি পাকিস্তানে আটক রয়েছেন, নিজ দেশের মানুষের মধ্যে তাঁর আসন গ্রহণ করবেন এবং বাংলাদেশকে শান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। মিসেস গান্ধী বলেন, ভারতীয় বাহিনী প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় সেখানে অবস্থান করবে না। তিনি আরও যোগ করেন, লাখ লাখ শরণার্থী ইতিমধ্যেই দেশের পথে পা বাড়িয়েছে। ●

দ্য টেস্টিমনি অব সিক্সটি

১০ পৃষ্ঠার পর

ট্র্যাজেডি নয়, একটা সমগ্র বিশ্বসম্প্রদায়ের জন্য ট্র্যাজেডি এবং এই সংকট নিরসনের জন্য একত্রে কাজ করা বিশ্বসম্প্রদায়েরই দায়িত্ব। শরণার্থীশিবিরে ভাগ্যাহত বিপন্ন মানুষের অবস্থান দেখে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তা উদ্ধৃত করে লন্ডন টাইমস লিখেছে, এটা মানবজাতির জন্য আমাদের সময়ের সম্ভবত সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

এডওয়ার্ড কেনেডি প্রশ্ন রেখেছেন, ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বাঙালিদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভই যদি অপরাধ হয়ে থাকে, তাহলে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কী?

সিনেটর কেনেডির সাত দফা

ওয়াশিংটন থেকে পাঠানো প্রতিবেদনটি নয়াদিল্লির টাইমস অব ইন্ডিয়ায় নভেম্বর ১৯৭১-এ প্রকাশিত হয়। মূল প্রতিবেদনের শিরোনাম: পূর্ব বাংলার জন্য মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির সাত দফা।

সিনেটে শরণার্থীবিষয়ক জুডিশিয়ারি সাব কমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর এডওয়ার্ড এম কেনেডি নিক্সন প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রেডক্রস আন্তর্জাতিক কমিটির প্রতিনিধিদের শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়ার জন্য, যেন পাকিস্তানে ওপর চাপ প্রয়োগ করা হয়।

কেনেডি বলেন, ইসলামাবাদ সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক শক্তিগুলোর প্রতীকী নেতৃত্ব শেখ মুজিবের। এই সংকটের যেকোনো রাজনৈতিক সমাধানে তাঁর প্রতি ন্যায়বিচার ও তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার গুরুত্ব সর্বাধিক। পূর্ব বাংলা ও ভারতের সংকট নিয়ে সিনেটর কংগ্রেসে যে সুপারিশ করেন, এটি তার একটি, যা গতকাল (১ নভেম্বর ১৯৭১) পেশ করা হয়।

অপর সুপারিশগুলো হচ্ছে–

১। দক্ষিণ এশিয়ার সংকটের মূল কারণ যুক্তরাষ্ট্রকে খতিয়ে দেখতে হবে।

২। দক্ষিণ এশিয়ার জন্য প্রেসিডেন্টকে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগ করতে হবে।

৩। দক্ষিণ এশিয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের মানবিক সাহায্যের পরিমাণ অবশ্যই বৃদ্ধি করতে হবে।

৪। স্টেট ডিপার্টমেন্টের আওতায় প্রেসিডেন্টকে একটি মানবিক ও সমাজসেবা ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫। জাতিসংঘের জরুরি সেবা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠায় যুক্তরাষ্ট্রকে বিশেষ সমর্থন জোগাতে হবে।

৬। পূর্ব বাংলার ট্র্যাজেডি অবশ্যই জাতিসংঘের সামনে উপস্থাপন করতে হবে এবং জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটিতে তা অন্তর্ভুক্তির বর্তমান প্রচেষ্টাকে যুক্তরাষ্ট্রের উৎসাহিত করতে হবে।

কেনেডি বলেন, ভারতে শরণার্থীর অব্যাহত বিশাল জোয়ার এবং দক্ষিণ এশিয়ায় যুদ্ধের হুমকি, ওদিকে পাকিস্তান সহিংসতা ও দাবিয়ে রাখার নীতি অনুসরণ করছে পূর্ব বাংলার মানুষ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। আর যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব ইচ্ছাকৃতভাবে এটাকে তুচ্ছ জ্ঞান করছে ইসলামাবাদ সেনা সরকারের সংবেদনশীলতার প্রতি আনুগত্যের কারণে। ●

সিনেটর কেনেডি

এক ঝাঁক ছোট পানকৌড়ি। ছবি: সংগৃহীত

মাছ শিকারের ব্যস্ত বৃহৎ পানকৌড়ি। ছবি: আলমাস জামান

পানকৌড়ির হাড়!

১৬ পৃষ্ঠার পর

পানকৌড়ির ঝাঁক আকাশ থেকে পানিতে নেমে পড়ে। তারপর ডুবসাঁতার দিতে দিতে সারিবদ্ধভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। পানিতে চলাচলের সময় এদের শুধু মাথা এবং ঘাড়ের কিছু অংশ ছাড়া শরীরের বাকি অংশ জলের নিচে ডুবে থাকে। এদের পা হাঁসের মতো, পানির নিচে ছোটার সময় এদের দেহের আকৃতি হয়ে যায় ছোটখাটো টর্পেডোর মতো। খুব দ্রুতগতিতে শিকারকে লক্ষ্য করে ছুটে যেতে পারে। এদের দৃষ্টিশক্তি খুবই প্রখর, পানির নিচে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পায়। এই পাখিদের ঠোঁট কিছুটা লম্বা আর ঠোঁটের অগ্রভাগ বাঁকানো। আর ওদের ঠোঁটের কামড়েও বেশ শক্তি রয়েছে। দুরন্ত গতি, প্রখর দৃষ্টিশক্তি আর ধারালো এবং শক্তিশালী ঠোঁটের কারণে তাদের শিকার খুব কমই হাতছাড়া হয়। শিকার হিসেবে এদের খাদ্যতালিকায় রয়েছে পুঁটি, টেংরা, চিংড়ি, ছোট শোল -গজার, টাকিসহ নানা জাতের মাছ। তবে অন্যান্য ছোট আকৃতির জলজ প্রাণীতেও এদের অরুচি নেই। পানকৌড়ি একবার ডুব দিয়ে প্রায় তিরিশ ফুট পর্যন্ত সামনে এগিয়ে যেতে পারে। এদের মাছ খাওয়ার দৃশ্যটা খুবই চমৎকার। জলের নিচে যেকোনো মাছকে ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরার পর পানির ওপর ভেসে ওঠে। এরপর অপূর্ব এক কৌশলে মাছটাকে ছুড়ে দেয় শূন্যে। পানকৌড়ি হাঁ করে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। আর নিচের দিকে পড়তে থাকা মাছের মাথাটা অবলীলায় এসে ঢুকে যায় পানকৌড়ির হাঁ করা মুখের ভেতর। এরপর তাৎক্ষণিক চালান হয়ে যায় পেটের মধ্যে। এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি, মাছ যত বড় হবে, পানকৌড়ি তাকে তত ওপরে ছুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। কখনো কখনো মাছের আকৃতি একটু বেখাপ্পা ধরনের হলে কিংবা মাছটা একটু বেশি শক্তিশালী হলে, সেটাকে খাবার উপযুক্ত কিংবা নিস্তেজ করার উদ্দেশ্যে একাধিকবার ছুড়ে দেয় আকাশের দিকে। তারপর টেনে নেয় গলার ভেতর।

অনেকেই হয়তো ভাবতে পারেন পানকৌড়ি হয়তো পানিতে বিচরণ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এ ধরনের ধারণা সঠিক নয়। পানকৌড়ি পানিতে ডুবসাঁতার দেয় নেহায়েত পেটের দায়ে। পেট ভরে মাছ খাওয়ার পর এরা শরীর শুকানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কোনো গাছের ডালে কিংবা বাঁশের খুঁটিতে বসে দুই ডানা প্রসারিত করে রোদ পোহাতে থাকে। ওদের দুই পাখা প্রসারিত করে বসে থাকার দৃশ্যটি যে একবার দেখেছে, সে কখনো ভুলতে পারবে না, দৃশ্যটা এতই মনোমুগ্ধকর। এভাবে রোদ পোহাতে পোহাতে ডানা এবং শরীর শুকিয়ে গেলে ওরা উড়ে যায় রাত্রিকালীন আবাসস্থলের দিকে।

এদের প্রজনন ঋতু শুরু হয় বর্ষাকালে। বিল-হাওরের আশপাশের কিংবা নদীর কাছে বড় বড় বাঁশঝাড়ে এরা বাসা বানাতে বিশেষ পছন্দ করে। বাঁশঝাড় ছাড়াও বিশাল আকৃতির আম, জাম কিংবা কড়ইগাছের মাথায়ও বাসা তৈরি করে। একসাথে অনেকগুলো বাসা দেখতে পাওয়া যায়। তাদের বাসার আকৃতি অনেকটা বকের বাসার মতো। একটি পরিপূর্ণ বাসা তৈরি করতে এদের সময় লাগে পাঁচ থেকে সাত দিন। এরা সাধারণ তিন থেকে পাঁচটি ডিম পাড়ে। ডিমের রং হালকা সবুজ। ১৮ থেকে ২০ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে আসে। সদ্য ফোটো বাচ্চাদের গায়ে কোনো পালক থাকে না। মা-বাবা মিলে বাচ্চাদের যত্ন করতে থাকে। বিল, হাওর কিংবা নদী থেকে ছোট মাছ এনে নিয়মিত বাচ্চাদের খাওয়ায় ওরা। আর বাচ্চারা খুব দ্রুত বেড়ে উঠতে থাকে।

দুই দশক আগেও দেশের বিল, হাওর আর নদীর বুকে ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট পানকৌড়ি উড়ে বেড়াত। কিন্তু বর্তমানে বিশেষ কিছু জায়গা ছাড়া এদের খুব একটা দেখতে পাওয়া যায় না। আর কীভাবেই বা দেখতে পাওয়া যাবে, দেশের অধিকাংশ নদীর জল পরিণত হয়েছে বিষাক্ত তরলে, উন্নত জাতের মাছ চাষের নামে দেশের বেশির ভাগ প্রাকৃতিক জলাশয় চলে গেছে মানুষের দখলে। কী খেয়ে বাঁচবে ওরা? এ ছাড়া আছে কিছু নির্দয় মানুষের উৎপাত। ওরা পানকৌড়ির কলোনি থেকে বাচ্চা চুরি করে বাজারে বিক্রি করে দেয়। এদের শক্ত হাতে দমন করতে হবে।

পানকৌড়ি ছিল গ্রামবাংলার অতি পরিচিত এক পাখি। বাড়ির পাশের ডোবা থেকে শুরু করে দূরের নদীমোহনা সব জায়গাতেই এদের কমবেশি দেখা যেত। এই পাখি নিয়ে আছে বিশেষ জনশ্রুতি। অনেকের বিশ্বাস, পানকৌড়ি একসময় মানুষ ছিল। সে ছিল এক কৃষক বাড়ির বউ। দেখতে কুচকুচে কালো আর মাছ খেতে খুব পছন্দ করত। কিন্তু স্বামী কিংবা শাশুড়ি কেউ তাকে একদম দেখতে পারত না। প্রতিনিয়ত তার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করত। একদিন বাড়িতে অনেক মাছ রান্না হলো। কিন্তু বউটিকে একটি মাছও খেতে দেওয়া হলো না। তখন মনের দুঃখে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে সে। মাছ খেতে না পারা সেই কুচকুচে কালো কৃষক বউই হচ্ছে পানকৌড়ি। তার গলাটা একটু লম্বা ছিল, পানকৌড়িরও তা-ই। আসলে সেই দুঃখী বৌটি অতঃপর পাখি হয়ে মনের সুখে নদী থেকে মাছ খেয়ে সে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। এটা নিছক গল্প মাত্র।

অন্যান্য কিছু বন্য প্রাণীর মতো পানকৌড়িদের নিয়েও একটি বিশেষ কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাস ছিল গ্রামবাংলার মানুষের মনে। অনেকেই বিশ্বাস করত, কারও শরীরে পানি এলে সেই রোগীর হাত-পায়ে পানকৌড়ির হাড় বেঁধে রাখলে দ্রুত শরীর থেকে পানি সরে যায়; যা অতি ভ্রান্ত একটি ধারণা। এই বিষয়টি আমি জানতে পারি আমার শিকারি জীবনে। তখন প্রায় সময় মানুষ আমার কাছে আসত পানকৌড়ির হাড়ের খোঁজে। তবে বরাবরই আমি এই বিষয়টাতে মানুষকে নিরুৎসাহিত করেছি। ●

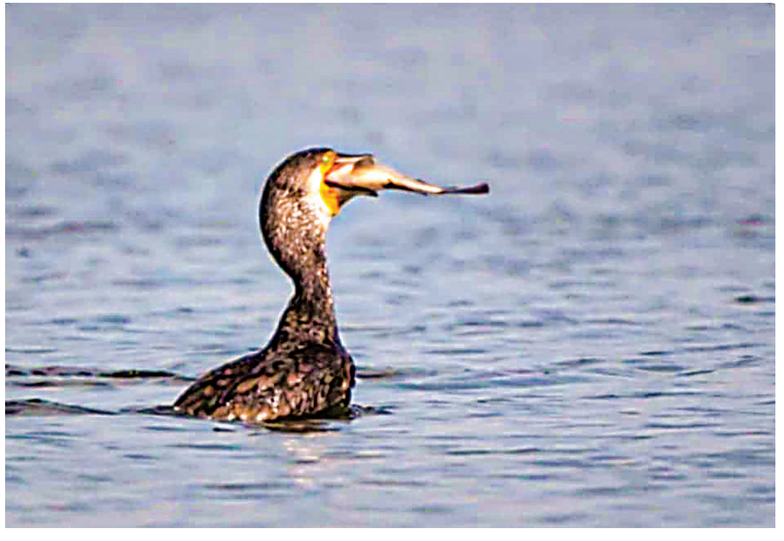

মাছ শিকার শেষে মোহনীয় কায়দায় ডানা শুকাচ্ছে ছোট পানকৌড়ি। ছবি: আলমাস জামান

পানকৌড়ির হাড়!

সরওয়ার পাঠান

প্রতিটি প্রজাতির পাখি আলাদা আলাদা পদ্ধতিতে প্রকৃতি থেকে খাবার সংগ্রহ করে থাকে। কেউ কেউ খাবার সংগ্রহ করে মাঠে ঘুরে ঘুরে, কেউ আবার খাবার সংগ্রহ করে মাটি খুঁড়ে, কেউ নদীর ধারে বসে থেকে, আবার কেউ খাবার সংগ্রহ করে আকাশে উড়ে উড়ে। তবে আমাদের দেশে এমন কয়েক প্রজাতির পাখি রয়েছে, যারা খাবার সংগ্রহ করে পানির নিচ থেকে। এসব পাখির মধ্যে যে পাখিটি ডুবসাঁতারে সবচেয়ে দক্ষ, তার নাম হচ্ছে পানকৌড়ি।

সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ৪০ প্রজাতির পানকৌড়ি রয়েছে। এদের মধ্যে আবার এমন কয়েক প্রজাতির পানকৌড়ি রয়েছে, যাদের জীবনের অর্ধেক সময় কাটে পানিতে বাকি অর্ধেক পানির ওপরে বসবাস করে। আমাদের এই বাংলাদেশে মোট তিন প্রজাতির পানকৌড়ি রয়েছে। এরা হচ্ছে বৃহৎ পানকৌড়ি, মাঝারি পানকৌড়ি এবং ছোট পানকৌড়ি। বৃহৎ পানকৌড়ি অল্পবিস্তর দেশের বিভিন্ন জলাশয়ে দেখা গেলেও মাঝারি পানকৌড়ির দেখা পাওয়া যায় খুবই কম। তাই দেশে পানকৌড়ি বলতে ছোট পানকৌড়িকেই বোঝায়।

পানকৌড়ি আমাদের দেশের মানুষের কাছে বিভিন্ন নামে পরিচিত। কেউ বলে পানি কাউয়া, কেউ বলে পানি কাউর, আবার কেউ ডাকে পানি কাক নামে। এসব নামকরণের জন্য দায়ী হচ্ছে এদের গায়ের রং। পানকৌড়িদের কুচকুচে কালো দেহের সঙ্গে কাকের দেহের রঙের এক অদ্ভুত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যদিও প্রজাতির দিক দিয়ে এরা কাক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ছোট পানকৌড়িদের ইংরেজিতে বলা হয় Little Cormorant, আর এদের বৈজ্ঞানিক নাম Phalacrocorax niger.

পানকৌড়ি কখনো একা বিচরণ করে আবার কখনো ঝাঁক বেঁধে চলাচল করে। একটি ঝাঁকে শতাধিক পাখিকেও বিচরণ করতে দেখা যায়। নদী, বিল বা হাওরে পানকৌড়িদের দলবদ্ধভাবে মাছ শিকার দেখার মতো একটা বিষয় বটে। শিকারের স্থান নির্ধারণের পর *এরপর পৃষ্ঠা ১৫*